কথা রাখোনি

প্রণব ভট্ট

'শ্রেয়া' খুব সাধারণ একটি মেয়ে। বাংলাদেশের অন্যসব মেয়ের মতোই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। অবশ্যই সেটি ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

মানুষের স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ হয় না। শ্রেয়ারও হলো না। লাল বেনারসিতে বউ সাজা হলো না... বাসর করা হলো না। তবুও জীবন থেমে থাকে না। আর জীবনের ধর্মই হলো স্বপ্ন দেখা। হঠাৎ একদিন স্বপ্নমাখা দৃষ্টি নিয়ে একজন এসে মেয়েটির সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি শ্রেয়া'।

শ্রেয়ার দুচোখে আবার স্বপ্ন ভিড় করে। সেই স্বপ্ন নিজের অজান্তেই ফুলে ফুলে ছাওয়া এক রঙিন বাসরে রূপান্তরিত হয়।

যে মেয়েটি জীবনে সুখের নাগাল পায় নি, একটু সুখের জন্য প্রকাশ পায় তার তীব্র আকুলতা। ভালোবেসে সে পেতে চায় কেবল একটু ভালোবাসা। শ্রেয়ার এই সামান্য চাওয়া তবে কি কোনোদিন পূরণ হবে না?

কথা রাখো

কথা রাখোনি • প্রণব ভট্ট

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০২

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

© | লেখক

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ১০০ টাকা

Katha Rakhoni | By Pranab Bhatta
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk 100 only
ISBN : 984 868 179 5

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।
(প্রথম দিনের সূর্য/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হুমায়ূন আহমেদ
যাঁর সত্তার স্বরূপের সন্ধানে আজও আমি মগ্ন

মেয়েটাকে কি সেলিম সত্যি ভালবেসে ফেলেছে ?

নইলে ওকে নিয়ে এত ভাবছে কেন সে ! গত ক'দিন ধরে সেলিম এই একটা প্রশ্ন নিয়ে, নিজের মধ্যেই নিজে অনবরত নাড়াচাড়া করেছে। কিন্তু, না। হ্যাঁ-বা-না কোনও উত্তরই খুঁজে পায়নি।

আজও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই এই একই ভাবনা পেয়ে বসে তাকে।

মেয়েটাকে সে আসলে দু'-একবার যে দেখেছে তা নয়। অনেকবার দেখেছে। কলা ভবনের সামনে, ক্যান্টিনে, টিএসসিতে কিংবা ভার্সিটির এখানে-ওখানে কতবার যে দেখেছে, তার কোনও হিসেব-নিকেশ নেই।

কী হয় কে জানে ! একবার দেখলেই কেন যেন বার-বার দেখতে ইচ্ছে করে। কেন যে ঘুরে-ফিরে এভাবে বার-বার দেখতে ইচ্ছে করে, কেন এত ভাল লাগে, নিজেও বুঝতে পারে না।

না, আসলে এত সুন্দর এর আগে কখনওই দেখেনি সে।

নজরকাড়া সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, ঠিক যেন তাই। হালকা-পাতলা গড়ন, মানানসই লম্বা, দুধে-আলতা গায়ের রং। তবে সবচে' যা সুন্দর তা হচ্ছে, দেবী প্রতিমার মতো মায়াবী মুখের ওপর ওর বড়-বড় দু'টি টানাটানা চোখ।

এমনিতে কোনও অচেনা মেয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার সাহস কোনও দিন ছিল না। ছোটবেলা থেকেই কেন যেন মেয়েদের এড়িয়ে চলেছে। লাজুক স্বভাবের বলে কি না কে জানে, পারলে মেয়েদের কাছ থেকে সব সময় দূরে-দূরেই থেকেছে।

একই সঙ্গে পড়ে কিংবা চেনাজানা কোনও মেয়ে কখনও সামনে পড়ে গেলে, কেন যেন কৌশলে এড়িয়ে যেতেই চেয়েছে। যদিও বা কথা বলতে হয়েছে, মাথা তুলে কিছুতেই কথা বলতে পারেনি।

এ্যদ্দিন মেয়েদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি যে সেলিম, তার হঠাৎ কী হয় কে

জানে ! মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু হঠাৎ করে আলাপ করার মতো সাহস তার কোনওদিন ছিল না, আজও নেই।

তাই বলে যে দু'জনের আলাপ-পরিচয় হয় না, তা তো নয়। এমন ভাবে আলাপ-পরিচয় হয়, যা সেলিম ভাবতেও পারেনি কখনও।

এমনিতে সময় পেলেই রমনা পার্কে, চন্দ্রিমা উদ্যানে বা এখানে-ওখানে ঘুরতে-বেড়াতে যায়। গত পরশু বিকেলে হাতে কোনও কাজ না থাকায় চন্দ্রিমা উদ্যানে খানিক ঘুরতে গিয়েছিল।

বিকেল গড়িয়ে সবে সন্ধ্যা নামব-নামছি করছে। দেখে, দূরে অনেক দিন দেখা সেই নজরকাড়া মেয়েটাকে চার-পাঁচজন যুবক ঘিরে ধরেছে।

স্বভাবতই থমকে দাঁড়াতে হয়েছে মেয়েটিকে।

কেন যেন নিজের অজান্তেই এক পা দু'পা করে মেয়েটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকদের কাছে এগিয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই কোনও গণ্ডগোলের ধারেকাছে যায়নি। সামান্য গণ্ডগোল দেখলেই সব সময় দূরে সরে থাকার অভ্যাস। আজ কেন যে দেখেও এগিয়ে যায়, নিজেও বুঝতে পারে না।

মেয়েটা কিছু বলার আগেই যুবকদের মধ্যে একজন বিশ্রী হেসে মেয়েটাকে বলে, 'কী নাম রে তোর ?'

জোর প্রতিবাদ করতে পারে না। তবু নজরকাড়া সুন্দর মেয়েটা বলে, 'আমাকে তুই করে বলছেন কেন, বলুন তো ! আমাকে এভাবে তুই-তুমি করে বলা কি ঠিক ?'

যুবক আবার কিছু বলবে বলে বোধহয় মুখ খুলছিল। কিন্তু তার আগেই হি হি করে হেসে একজন বলে, 'আরে দেখ, এ যে দেখছি আমাদের শিক্ষকের মতো জ্ঞান দিচ্ছে রে।'

বোধহয় ভয় পায়। কোনওমতে এবার বলে, 'পথ ছাড়ুন। দয়া করে আমাকে যেতে দিন।'

এবার আরেকজন বলে, 'সুন্দর ! তুই সত্যই বড় সুন্দর রে মাইয়া ! বল না, তুই এত সুন্দর ক্যান ! বল নারে মাইয়া !'

বেশ ভয় পায়। অসহায়ের মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে শুষ্ক গলায় বলে, 'আপনাদের পায়ে পড়ি। আমাকে যেতে দিন। প্লিজ !'

বিশ্রী শব্দ করে হাসে। খিক্‌খিক্‌ করে হেসে প্রথম যে যুবক কথা বলছিল, সে আবার বলে, 'তুই চলে গেলে আমাদের কী হবে ? আমরা কারে ভালবাসব, কারে মহব্বত করব, তুই বল ?'

এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না।

তাই মাথা নিচু করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুই বলে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, একজন এবার আরও কাছে এগিয়ে যায়। বলে, 'তুই পায়ে পড়বি ক্যান সুন্দরী ? তোর ঠিকানা তো আমাগো বুকে। আয়, বুকে আয় মাইয়া। আয়, একটু ভালবাসি তোরে।'

কথা শেষ করে যে চুপ থাকে তা নয়। এবার ওড়না ধরে টানাটানি শুরু করে।

কী হয় কে জানে, সেলিমের মাথায় বোধহয় ছলাৎ করে এক চিলতে রক্ত উঠে যায়। দ্রুত সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'এই, তোমরা কী চাও ? কী চাও তোমরা ?'

সেলিমকে হঠাৎ এভাবে কথা বলতে দেখে, খিক্‌খিক্ করে হেসে একজন বলে, 'নাবালক পোলা নাকি তুই ? বুঝস্ না, আমরা কী চাই ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'ছেড়ে দাও। তোমরা ওকে ছেড়ে দাও বলছি।'

খেঁকিয়ে ওঠে। খেঁকিয়ে একজন বলে, 'এই, তোর আর বেঁচে থাকতে মন চায় না রে ?'

শোনে কী না শোনে কে জানে ! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বলে, 'বলছি ছেড়ে দাও। যেতে দাও ওকে।'

যুবকদের মধ্যে একজন শব্দ করে হাসে। হেসে বলে, 'বলছি, মায়ের ছেলে মা'র কোলে ফিরে যা। মিছামিছি ফুট করে গুলি-টুলি খেয়ে মরে যাবি তো খোকা।'

সেই শৈশব থেকে সব সময় গোলমাল এড়িয়ে চলা সেলিমের কী হয়, নিজেও বুঝতে পারে না। চিৎকার করে বলে, 'না। আমি যাব না।'

কথা শেষ করে যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তাও নয়। দ্রুত ছুটে গিয়ে মেয়েটার একটা হাত ধরে বলে, 'চলুন। আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'বুঝছি। তোর কপালে স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা নাই। বুঝছি। তোর মৃত্যু আল্লাহ্‌পাক আমাগো বেআইনী অস্ত্রের মধ্যেই লেইখ্যা রাখছে বাছা।'

কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করে না। কোমরে গুঁজে রাখা রিভলবার বের করে। শুধু বের করেই যে ক্ষ্যান্ত হয়, তা নয়। পর-পর দু'টি গুলি ছোঁড়ে। একটা গুলি এসে লাগে ডান পায়ের গোড়ালীতে, অন্যটা বাম হাতের কব্জিতে।

গুলির শব্দ শুনে চতুর্দিক থেকে লোকজন ছুটে আসার আগেই, বখাটে যুবকেরা ঠিকই যার-যার মতো দ্রুত পালিয়ে যায়।

যখন জ্ঞান ফেরে, তখন আর রাত নেই, সকাল হয়ে গেছে। একটু-একটু করে চারদিকে সকালের আলোও ফুটতে শুরু করেছে।

চোখ খুলে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে। কোথায় এসেছে, কেন এসেছে, কিছুই বুঝতে পারে না। তাই অস্ফুট স্বরে সেলিম বলে, 'আমি কোথায় !'

বেডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নার্স দ্রুত বলে, 'আপনি ক্লিনিকে।'

'আমি ক্লিনিকে কেন !'

সেলিমের এ প্রশ্নের উত্তরে আর চুপ করে থাকতে পারে না। নার্সের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নজরকাড়া সুন্দর মেয়েটি এবার বলে, 'চন্দ্রিমা উদ্যানে কয়েকটা বখাটে যুবকের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে গিয়েই, আপনার এই অবস্থা হয়েছে।'

এক-এক করে মনে পড়ে যায় সব। যুবকদের কাছ থেকে মেয়েটাকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছিল। যুবকদের মধ্যে একজন কোমর থেকে অস্ত্র বের করে পর-পর দু'টি গুলি ছোঁড়ে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

শরীরে খুব যন্ত্রণা। কী ভেবে নিজের শরীরের দিকে তাকায়। দেখে হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ।

কী হয় কে জানে ! অনিন্দ্য সুন্দর মেয়েটাকে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এত যন্ত্রণাকেও যেন যন্ত্রণা মনে হয় না তার ! ধীরে-ধীরে বলে, 'আপনি কখন এসেছেন ?'

মেয়েটা কিছু বলার আগেই নার্স বলে, 'উনি তো কাল সন্ধ্যায় এসেছেন। আর যাননি।'

শুনে অবাক হয়ে যায়। হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকে, পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটির মুখের দিকে। কোনওমতে বলে, 'আপনার বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে না ?'

দ্রুত বলে, 'আপনাকে এভাবে ফেলে আমি কী করে বাড়ি যাই বলুন ?'

ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে সেলিমের। শরীরের বহতা রক্তের মধ্যে একটা অজানা খুশি যেন দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

সেলিম বলে, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

মাথা নিচু করে বলে, 'বাসাবো।'

'মেয়ে মানুষ। রাতে বাড়ি যাননি। আমার মনে হয় আপনার এবার বাড়ি যাওয়া উচিৎ।'

সেলিমের কথা শুনে, একপলক মাথা তুলে সেলিমকে দেখে। তারপর মাথা নিচু করে বলে, 'আমার বাসায় আমি রাতে টেলিফোন করে দিয়েছি। আপনার বাসায় কিন্তু এখনও খবর দেয়া হয়নি। টেলিফোন নাম্বার জানি না তো। তাই খবর দিতে পারিনি।'

হ্যাঁ, তাই তো। বাবা-মাকে এখনও জানান হয়নি। এখন সকাল। কখনও সে এমন করে না। নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

সেলিম টেলিফোন নাম্বার বলে।

ভ্যানেটিব্যাগ থেকে কাগজ-কলম বের করে, নাম্বার টুকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় সে।

বুঝতে পারে সেলিম, টেলিফোন করার জন্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল।

আবার কেবিনে ফিরে আসতেও খুব বেশি যে সময় লাগে তা নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসে। এসেই বলে, 'আপনার মা-বাবা ও ছোট বোন তিনজনই আসছেন। আপনার মা-ই টেলিফোন ধরেছিলেন।'

কথা শেষ হতে না হতেই দ্রুত বলে সেলিম, 'মা কী বললেন ?'

সেলিমের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, মনে হয় এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে! তারপর বলে, 'কী আবার বলবেন ! আমার কথা বোধহয় ভাল করে শুনলেনও না। ছেলে গুলি খেয়েছে শুনেই, হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।'

নিজের অজান্তেই সেলিমের দু'টি চোখ জলে ভরে ওঠে। সে কোনওমতে বলে, 'ক্লিনিকের নাম-ঠিকানা বলেছেন ?'

'হ্যাঁ, বলেছি। তবে আপনার মাকে কিন্তু বলতে পারিনি।'

দ্রুত বলে সেলিম, 'এ সময় তো বাবা অফিসে চলে যান। তো কাকে বলেছেন আপনি ?'

মাথা নিচু করে বলে, 'আপনার মা তো কেবল আমার খোকা, আমার খোকা বলে কাঁদছিলেন। আমি তাই আপনার ছোট বোনকে সব বলেছি। ও লিখেও নিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই চলে আসবে বলল।'

মেয়েটার কথা শেষ হলে, কেন যেন সেলিম আর কিছু বলে না।

সেলিমকে চুপ করে থাকতে দেখে অনিন্দ্য সুন্দর মেয়েটা আবার বলে, 'আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে, জানেন ?'

সেলিম বলে, 'কেন ?'

'কেন যে গতকাল বিকেলে এভাবে বেড়াতে গেলাম !'

'তাতে কী হয়েছে ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে পাখির নীড়ের মতো দুটো চোখ তুলে, গভীর ভাবে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তো আপনার এই অবস্থা। কত বড় অপারেশন হয়েছে, জানেন ? যদি মরে যেতেন, তাহলে ?'

হাতে-পায়ে যন্ত্রণা। তবু হাসে। ম্লান হেসে বলে, 'মরে গেলে যেতাম।'

'ছি ! এ কথা বলবেন না। ভাল ছাত্র আপনি। চমৎকার আবৃত্তির গলা আপনার। '

এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে বুঝতে পারে না। তাই দ্রুত বলে সেলিম, 'আপনি চেনেন নাকি আমাকে !'

মাথা নিচু করে বলে, 'আপনাকে কে না চেনে বলুন ! আপনার মতো একজন মেধাবী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইট-বালুতেও চেনে।'

মনটা বোধহয় কানায়-কানায় ভরে যায়। যার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করার জন্য মনটা এতদিন আনচান করছিল, সে শুধু তাকে চেনেই না, তার সম্পর্কে সব জানেও।

দ্রুত বলে সেলিম, 'আমার কিন্তু ভালই লাগছে।'

চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকায়। বলে, 'কী বলছেন ! ভাল লাগছে আপনার !'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'হ্যাঁ। সত্যি বলছি। গুলিবিদ্ধ হয়েও ভাল লাগছে আমার।'

অবাক হয়। যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছেন আপনি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শরীরে এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসে। হেসে বলে, 'জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর আপনিই আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে এসেছেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমিই এনেছি।'

'এভাবে গুলি খেয়ে অজ্ঞান না হলে, এ সুযোগ কি কখনও আমার হত, বলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এভাবে কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় কি হত, আপনিই বলেন ?'

মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আপনি চাইলেই তো যে কোনও মুহূর্তে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন।'

মাথা নিচু করে কথা বলা সুন্দর মুখের মেয়েটার কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'চেয়েছি। কিন্তু কোনও অচেনা মেয়ের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলার সাহস, আমার কখনও ছিল না।'

আবার বোধহয় খানিক ভাবে ! তারপর বলে, 'আপনি আমার নাম জানেন ?'

'না।'

'আমার নাম শ্রেয়া। শরমিন সুলতানা। ডাকনাম, শ্রেয়া।'

'সুন্দর !'

সেলিমের কণ্ঠে হঠাৎ 'সুন্দর' শুনে যেন কেঁপে ওঠে শ্রেয়া ! দ্রুত বলে, 'কী বললেন !'

কী হয় কে জানে ! সেলিম বলে, 'আপনার নাম এবং আপনি দুটোই সত্যি সুন্দর। তবে আপনি নিজে এত সুন্দর যে,—'

সেলিম কথা শেষ করতে পারে না। তার কথার মধ্যেই বাবা পঞ্চাশোর্ধ্ব আফজাল হোসেন, মা মরিয়ম বেগম ও ছোট বোন বৈশাখী এসে ঢোকে।

'কী হয়েছে বাবা ? কী হয়েছে তোর ?' বলেই মরিয়ম বেগম ঝড়ের বেগে কেবিনে ঢুকেই গুলিবিদ্ধ ছেলের বেডের কাছে ছুটে যান।

মা'র এই ব্যাকুলতা দেখে সেলিম দ্রুত বলে, 'আমি ভাল আছি মা।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা ! উদ্বিগ্ন মায়ের হৃদয় বলে কথা। মরিয়ম বেগম ছেলের মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভাল আছিস তো বাবা ? ভাল আছিস তো তুই ?'

'বলছি তো মা, আমি এখন ভাল আছি। তবে শোনো মা, ঐ যে দেখছ শ্রেয়া নামের উনি কেবিনের কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।'

কেবিনে ঢুকে এতক্ষণ কারও খেয়ালই ছিল না, শ্রেয়া কেবিনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলবেন বলে বোধহয় মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু আগেই আফজাল হোসেন বলেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ মা।'

আফজাল হোসেন কথা শেষ করতে পারেন না, তার আগেই মরিয়ম বেগম বলেন, 'হ্যাঁ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মা।'

সেলিম আবার বলে, 'অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। উনিই এখানে এনেছেন। অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন।'

মরিয়ম বেগম এবার শ্রেয়ার কাছে ছুটে যান। শ্রেয়াকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায়, চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'দোয়া করি, বেঁচে থাক মা। বেঁচে থাক। অনেকদিন তুমি পরম সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাক মা।'

শ্রেয়ার হঠাৎ কী হয় কে জানে ! বলে, 'আপনার ছেলে ভুল বলেছেন।'

মরিয়ম বেগম স্বভাবতই অবাক হন। অবাক হয়ে বলেন, 'কেন মা ! এ কথা বলছ কেন !'

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'আমাকে বাঁচাতে গিয়েই আপনার ছেলের এই হাল হয়েছে। উনি আমার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। ধন্যবাদ তো দেয়া দরকার আমারই ওনাকে। অথচ দেখুন, সমস্ত ধন্যবাদের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন উনি আমার মাথায়।'

মরিয়ম বেগম কিছু বলার আগেই আফজাল হোসেন এবার বলেন, 'হ্যাঁ। স্বীকার করতে হবে, ভাল কাজ একটা সেলিম করেছে। তবে তুমি যদি সেলিমকে ওভাবে ওখানে ফেলে চলে আসতে, তাহলে ? আমরা আমাদের সন্তানকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেলতাম না, বলো তুমি ?'

আফজাল হোসেনের এ কথার উত্তরে কী বলবে না বলবে বুঝতে পারে না শ্রেয়া। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রেয়াকে চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এবার বৈশাখী কাছে যায়। কাছে গিয়ে বলে, 'হেরে গেলেন তো আমার বাবার যুক্তির কাছে ? বাবার কথাই কিন্তু ঠিক। আপনি না থাকলে বাবা-মা তাঁদের ছেলে হারাত, আর আমি হারাতাম ভাই। ঠিক কি না, বলেন ?'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া আর চুপ থাকতে পারে না। বলে, 'আর আমি না থাকলে, আমাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচানোর দরকারই হত না। উনিও পর- পর দু'টি গুলি খেতেন না।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, বৈশাখী একগাল হেসে বলে, 'থাক। কে না থাকলে কী হত, এ যুক্তি-তর্ক এখন থাক। আগে নিজের পরিচয়টা বলি, কি বলেন ? ঐ যে সিনেমার নায়কের মতো লম্ফ দিয়ে নায়িকাকে উদ্ধার করতে গিয়ে, গুলি-টুলি খেয়ে বিছানায় চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে, উনি আমার ভাই। ভাই মানে, সবেধন নীলমণি একমাত্র ভাই। আর হ্যাঁ, আমিও তার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, অনলি ওয়ান পিস বোন।'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া হেসে বলে, 'কী নাম আপনার ?'

'বলব না। কিছুতেই বলব না, বুঝেছেন ?'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'কেন বলুন তো ?'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই বৈশাখী দ্রুত বলে, 'আপনি আমাকে কী বলেছেন, বলুন ?'

শ্রেয়া যার-পর-নাই অবাক হয় ! অবাক হয়ে বলে, 'কী বলেছি !'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'আমাকে আপনি বলছেন কেন ? জবাব দিন ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'ঠিক আছে। এবার থেকে তুমি বলব, হল ?'

বৈশাখীও হাসে। হেসে বলে, 'হয়নি মানে ? হয়েছে। একশ' বার হয়েছে। হাজার বার হয়েছে। হ্যাঁ, ঝটপট এবার নিজের নামটা বলতে হয়। নাম হচ্ছে, নুসরাত জাহান। ডাক নাম, বৈশাখী। এক কালবৈশাখীর ঝড়ো সন্ধ্যায় জন্ম বলে বোনের নাম রেখেছে ভাইয়া, বৈশাখী। তা এবার বলুন, আপনার নাম বলুন ?'

হেসে বলে, 'আমার নাম শ্রেয়া।'

'হতেই হবে। সুন্দর মানুষের সুন্দর নাম হতেই হবে। তা আপনাকে আমি কী বলে ডাকব, বলুন তো ? আপাতত শ্রেয়া আপু বলেই শুরু করি, কি বলেন ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বেশ তো, তাই হবে। আমাকে তুমি শ্রেয়া আপু বলেই ডাকবে।'

'তাহলে শোনেন শ্রেয়া আপু, বেবিট্যাক্সিতে আসতে-আসতে তিনজন একনাগাড়ে কাঁদতে-কাঁদতেই আসছিলাম। বাবা, মা ও আমার মধ্যে কে কম কেঁদেছি, কে বেশি কেঁদেছি জানি না। কত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এসে দেখি, ভাইয়া কথা বলছে। ব্যস, মনটা আনন্দে রুমঝুম নেচে উঠল।'

শ্রেয়া দেখে কথা বলতে-বলতে বৈশাখীর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

শ্রেয়া নয়, বৈশাখীই আবার বলে, 'ভাইয়া তার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে আমাকে, জানেন ? ভাইয়ার কাছেই যেন আমার রাজ্যের যত আবদার। ভাইয়ার টিউশনির টাকার পুরোটার ওপরই যেন আমার একচেটিয়া অধিকার। আজ এটা চাই, তো কাল ওটা চাই, লেগেই আছে। ভাইয়াও হাসিমুখে আমার সব আবদার পূরণ করে, জানেন ?'

বৈশাখীকে একনাগাড়ে কথা বলতে দেখে, সেলিম বোধহয় আর চুপ থাকতে পারে না। তাই বলে, 'এক নাগাড়ে বক্‌বক্ করে চলেছিস। এই, তুই থামবি ? শোনেন শ্রেয়া, আমার এই গুণধন বোনটিকে আমি কী বলি, জানেন ? ঝড়ের মতো সারাদিন-রাত ঠোঁট দুটো নাড়ছে তো নাড়ছেই। কথা বলছে তো বলছেই। তাই আমি ওকে শুধু বৈশাখী না বলে, বলি বৈশাখী ঝড়। তা

বলছিলাম শ্রেয়া, আপনি বাড়ি যাবেন না ? জানো মা, কাল সন্ধ্যায় সেই যে আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে এসেছেন, তারপর থেকে উনি আর বাড়িমুখো হননি।'

সেলিমের কথা শুনে মরিয়ম বেগম বলেন, 'কী বলছিস বাবা ! ছি ছি, তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই ভাবছেন। তুমি এখন বাড়ি যাও, মা শ্রেয়া।'

বৈশাখী চুপ করে থাকার মেয়ে নয়, চুপ করে থাকেও না। মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতেই বৈশাখী বলে, 'মা ঠিক বলেছেন। শ্রেয়া আপু, আপনি এখন বাড়ি যান। বাবা ভাইয়ার গুলি লাগার কথা শুনে, অফিস থেকে পাগলের মতো ছুটে এসেছেন। বাবা এখন নিশ্চয়ই আবার অফিসে যাবেন। মা'রও এখন রান্না-বান্নার কাজ আছে। এখন আমিই ভাইয়ার কাছে থাকব।'

মরিয়ম বেগম আবার বলেন, 'বেশ তো, বৈশাখী এখন সেলিমের কাছে থাক। তুমি বাড়ি যাও মা। বিকেলে না হয় একবার এসো।'

সারারাত ঘুমায়নি। কাল বিকেল থেকে কিছু খায়ওনি। আসলে গুলিবিদ্ধ সেলিমকে নিয়ে সারারাত ধরে একটা ঘোরের মধ্যেই ছিল। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবেওনি, মনেও নেই। হ্যাঁ, তাই। বাড়ি যাওয়া দরকার। গোসল করে ফ্রেস হয়ে সামান্য কিছু হলেও এবার মুখে দেয়া দরকার।

এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে টেবিল থেকে নিজের ভ্যানেটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে, মাথা তুলে খানিক বিছানায় শায়িত সেলিমকে দেখে। তারপর বলে, 'আমি তাহলে এখন আসি বৈশাখী। বিকেলে আবার আসব।'

শ্রেয়ার কথার উত্তরে বৈশাখী কিছু বলার আগেই, মরিয়ম বেগম বলেন, 'এসো, মা।'

শ্রেয়া চলে যায়।

শ্রেয়া চলে যেতেই মধ্যবয়সী ডাক্তার নার্সসহ কেবিনে এসে ঢোকেন। কেবিনে উপস্থিত সবার দিকে হালকা চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ডাক্তার রোগীর বেডের কাছে দ্রুত এগিয়ে যান। রোগীকে খানিক দেখে, নার্সকে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলেন। নার্স দ্রুত সেলিমের মাথার কাছের টেবিলের ড্রয়ার থেকে, একটা ইঞ্জেকশন বের করে সেলিমকে পুশ করে।

আফজাল হোসেন আর অপেক্ষা করতে পারেন না। পিতার অন্তর বলে কথা। তিনি ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'কেমন আছে আমার খোকা, ডাক্তার সাহেব ?'

গম্ভীরমুখো ডাক্তার মাথা তুলে একপলক আপাদমস্তক আফজাল হোসেনকে দেখেন। তারপর বলেন, 'আপনার ছেলে ?'

আফজাল হোসেন বলেন, 'জি।'

ডাক্তার রোগীর পাল্‌স পরীক্ষা করতে-করতে বলেন, 'ভাল ছেলে।'

আফজাল হোসেন ডাক্তারের কথা বুঝতে পারেন না। তাই বলেন, 'বিশ্বাস করেন, ও খারাপ না। লেখাপড়া ছাড়া ও আর কিছুই জানে না। শখ অবশ্য একটা আছে। কবিতা আবৃত্তি করে। ঢাকা শহরে ভাল কিংবা খারাপ কোনও বন্ধু-বান্ধবই ওর নেই।'

গম্ভীরমুখো ডাক্তারের চোখে-মুখে যৎসামান্য হলেও বোধহয় খানিকটা হাসি দেখা যায়। তিনি বলেন, 'কোনও বন্ধুই নেই। তার মানে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস কিংবা অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, কোনওটা হওয়ারই চান্স নেই। হ্যাঁ, ছেলেটা ভাল এ কথা বলতেই হবে। নইলে আজকালকার জামানায় কেউ কারও জন্যে কিছু করে, বলেন ? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা মেয়ের সম্মান বাঁচিয়েছে আপনার ছেলে। ভাল বলব না, বলেন আপনি ?'

ছেলের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে না, তা নয়। কিন্তু আফজাল হোসেন আসলে এখন ছেলের অবস্থা জানার জন্যেই, ভেতরে-ভেতরে ব্যাকুল হয়ে আছেন। তাই আবার বলেন, 'কেমন দেখলেন, ডাক্তার সাহেব ? ভাল তো ? ভয়ের কিছু নেই তো ?

রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার নার্সসহ বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আফজাল হোসেনের কথা শুনে, এবার দরজার কাছে গিয়ে বলেন, 'না, নেই। ভয়ের কিছু নেই।'

কথা শেষ করে ডাক্তার আর দাঁড়ান না। নার্সসহ কেবিন থেকে বেরিয়ে যান।

শুধু আফজাল হোসেন নয়, ডাক্তারের কথা শুনে মরিয়ম বেগম, বৈশাখীসহ কেবিনে সবাই যেন দ্রুত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ডাক্তারের বলা 'না, নেই। ভয়ের কিছু নেই' শুনে, সামান্য হলেও দুশ্চিন্তা যেন কমে সবার।

হলুদ রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে এবং একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে, বিকেল চারটে নাগাদ শ্রেয়া আবার ক্লিনিকে আসে।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে সেলিমের। ঘুম ভাঙতেই দেখে, সেজেগুজে ফুল হাতে শ্রেয়া হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মনটা অপরিসীম ভাল লাগায় ভরে যায় তার। নিজের অজান্তেই বলে ফেলে, 'সুন্দর !'

সেলিমের মুখে 'সুন্দর' শুনে চমকে ওঠে শ্রেয়া!

নিজের অজান্তে কথাটা বলে ফেলে, নিজেও কম অবাক হয় না সেলিম। শ্রেয়ার দিকে আর কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কেবল এদিক-ওদিক তাকায়।

কেবিনের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে থেকে, বৈশাখী আগাগোড়া সব দেখে। স্বভাবতই বেশ মজা পায়। মজা পেয়ে বৈশাখী বলে, 'শ্রেয়া আপু, আমি না হয় এখন যাই। কেবিনের বাইরে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঘুরে আসি। মনে হচ্ছে, এই অপূর্ব দৃশ্য বেশ খানিকটা সময় ধরে চলবে। যাই তাহলে, কি বলেন ?'

কথা শেষ করে বৈশাখী যে আর চেয়ারে বসে থাকে, তা নয়। দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শ্রেয়া দ্রুত গিয়ে বৈশাখীকে ধরে। একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আরে, কী করছ ? তুমি চললে কোথায়, বৈশাখী ?'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই, বৈশাখী হেসে বলে, 'আমার মনে হয়, এখানে এখন আর তৃতীয় কোনও জনমানবের উপস্থিতি অন্য কারও ভাল নাও লাগতে পারে।'

শ্রেয়া বৈশাখীকে দরজার কাছ থেকে, কেবিনের ভেতরে টেনে আনে। বৈশাখীর ধরে রাখা হাতটা ছেড়ে দিয়ে এবার বলে, 'না। তুমি এখন কোথাও যাবে না, বুঝেছ ? তারচে' এসো,আমরা দু'জনে গল্প করি।'

বৈশাখী শ্রেয়ার কথা শুনে মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'আপনি কি আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন ?'

হঠাৎ কী হয় কে জানে ! বৈশাখীর এই কথা শুনে, মুখের অমলিন হাসিটুকু কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় ! শ্রেয়াকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে, বৈশাখীও কম অবাক হয় না !

শ্রেয়া বলে, 'না, বৈশাখী। গল্প করতে নয়। আমি আমার জন্যে জীবন দিতে যাওয়া, তোমার ভাইকে দেখতে এসেছি।'

শ্রেয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তনে বৈশাখী অবাক হয়ে শ্রেয়াকে দেখে। কিন্তু কিছু বলে না।

কেবিনে নার্স নেই। কেবিন জুড়ে তিনজনের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও নেমে আসে পিনপতন নীরবতা।

মুহূর্তের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় শ্রেয়া। হাসে। হেসে বলে, 'তোমার নাম জানলাম। কিন্তু তুমি কী পড়ো, তা তো জানলাম না বৈশাখী ?'

বৈশাখীর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ফ্যালফ্যাল করে শ্রেয়াকে তখনও দেখে সে। দেখে বলে, 'আমি গত বছর মাধ্যমিক পাশ করেছি।'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'মাত্র কলেজে পা রেখেছ ?'

মাথা নেড়ে বৈশাখী বলে, 'হ্যাঁ।'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'তার মানে তোমার বয়স তো খুবই কম। এত অল্প বয়সেও অগ্রিম এত কিছু বোঝ তুমি ?'

বৈশাখী ঘাবড়ে যাবার মেয়ে নয়। সে শ্রেয়ার কথা শুনে হাসে। হেসে বলে, 'মেয়েরা অনেক অল্প বয়সেই এসব বুঝতে শেখে।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে কি না কে জানে, শ্রেয়া এবার বলে, 'তোমার সঙ্গে গল্প করব বলেছিলাম। এসো, গল্প করি। প্রথমে বলো, মাধ্যমিকে মোট কত নাম্বার পেয়েছ ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে, বৈশাখী একগাল হেসে বলে, 'ধ্যাৎ, একে কী গল্প করা বলে নাকি ? দেখে তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।'

শ্রেয়াও হাসে। হেসে বলে, 'ধরো, ইন্টারভিউই নিচ্ছি। তো বলো ? মাধ্যমিকে কত পেয়েছ ?'

বৈশাখী মাথা নিচু করে বলে, 'নয়শ' আঠার।'

নয়শ' আঠার নাম্বার পেয়েছে শুনে, শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'এত নাম্বার পেয়েও মেধা তালিকায় নাম ছিল না তোমার ?'

বৈশাখী মুচকি হেসে বলে, 'না। সে ভাগ্য সবার হয় না। কারও-কারও হয়।'

বৈশাখীর এভাবে বলা কথা, শ্রেয়ার বোঝার কথা নয়। বোঝেও না। শ্রেয়া তাই বলে, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না, বৈশাখী। সে ভাগ্য সবার হয় না, কারও-কারও হয়, এ কথা বলছ কেন?'

বৈশাখী হাসে। এবার আর মৃদু হাসি নয়। খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'কী আর বলব শ্রেয়া আপু, সে এক ইতিহাস। আমাদের পরিবারে সে সৌভাগ্যের ইতিহাস বহন করছে, আপনার জন্যে পর-পর দুটো গুলি খেয়ে জান কোরবান করতে যাওয়া আমার একমাত্র ভাইয়া। হ্যাঁ, এমন ফাটা একটা কপাল ওনার, আজ পর্যন্ত জীবনে কোনও পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তৃতীয় বা চতুর্থ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সারা জীবন ধরে কেবল ফার্স্ট আর ফার্স্ট। সহ্য হয়, বলেন?'

উচ্ছল তরুণী বৈশাখীকে যত দেখে, ততই যেন ভাল লাগে শ্রেয়ার। চুপচাপ থাকা যেন তার স্বভাব বিরুদ্ধ। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অমলিন হাসি যেন সব সময় লেগেই আছে।

শ্রেয়া বলে, 'তুমি তোমার ভাইয়াকে খুব ভালবাস, না?'

শ্রেয়ার এ প্রশ্নে যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে-হাসতে বলে, 'এক বোনকে কি না জিজ্ঞেস করছেন, সে তার ভাইকে ভালবাসে কি না? শ্রেয়া আপু, শুধু ভালবাসি বললে ভুল বলা হবে। আমার এই স্কলার ভাইটিকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তবে হ্যাঁ, আমি এত ভালবাসলেও, ভাইয়া কিন্তু আমাকে একটুও ভালবাসে না, জানেন? আমি আড্ডা দিতে, টিভি দেখতে ভালবাসি। কিন্তু ভাইয়া দেবে না। সারাদিন শুধু একটা কথাই বলবে, যাও, পড়তে বস। ভাল লাগে, বলেন?'

বিছানায় শুয়ে হাসিমুখে সব শুনছিল। অনেকক্ষণ পর এবার দু'জনের কথার মধ্যে সেলিম বলে, 'জানেন শ্রেয়া, মাত্র দু' নাম্বারের জন্যে মেধা তালিকায় নাম ছিল না। কী বলব আপনাকে, সারাদিন ঘুমাবে। টিভি দেখবে। আড্ডা দেবে। এমন আড্ডাবাজ মেয়ে আমি আর দেখিনি, জানেন?'

সেলিমের কথা শুনে, ফোঁস করে ওঠে বৈশাখী। বলে, 'আর তুমি? তুমি তো ঘুমাওই না। সারাদিন একগাদা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাক। সময় মতো খাবে না। সময় মতো ঘুমাবে না। সারাক্ষণ শুধু পড়া আর পড়া। শোনেন শ্রেয়া আপু, চরিত্রের আর একটা গুণ শোনেন, মেয়েদের কাছ থেকে কেবল পালিয়ে বেড়াবে। আরে, মেয়েরা কি বাঘ না ভাল্লুক, যে হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

বৈশাখীর কথায় শ্রেয়া হাসে। শ্রেয়াকে হাসতে দেখে খানিক থেমে, বৈশাখী আবার বলে, 'আপনি হাসছেন? আরে সবে তো শুরু, হাসির কথা তো বলাই হয়নি এখনও। শোনেন শ্রেয়া আপু, একদিন আমার তিন বান্ধবী

আমাদের বাড়িতে এসেছে, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া আমার ব্রিলিয়ান্ট ভাইকে দেখতে। তারপর কী হল শোনেন, পুঁচকি মেয়েগুলোকে দেখেই ভাই আমার চোখ তুলে, মুখ তুলে আর তাকাতে পারে না। নতুন বিয়ে হওয়া ঘোমটা দেয়া বালিকা বধূর মতন, ভয়ে আর লজ্জায় সেঁধিয়ে থাকল। এবার আপনি এসেছেন। আমার ধারণা, এবার বোধহয় সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে তাই বলে, 'তার মানে ! এবার ম্যানেজ হয়ে যাবে মানে !'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে রেখে বৈশাখী বলে, 'আমার বিশ্বাস, এবার সমস্ত ভূতই পড়ি কী মরি করে পালাবে। পালাবে মানে আপনিই এবার সব ক'টাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তবে ছাড়বেন।'

বৈশাখীর কথা শ্রেয়া বুঝতে পারে না। হতবাক হয়ে তাই বলে, 'তুমি কী বলছ, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না বৈশাখী।'

শ্রেয়ার কথা শুনে একই রকম রহস্যময় হাসি হেসে বৈশাখী বলে, 'উপর্যুপরি দুটো গুলি খেয়েও চিৎপটাং হয়ে যেভাবে বিছানায় শুয়ে রাত-দিন হাসছে, ওঝা যে এবার একজন এসে গেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

বৈশাখীর রহস্যময় হাসি হেসে বলা কথা, এবার বুঝতে পারে। শুধু বুঝতে পারা নয়, লজ্জায় আড়ষ্ট হতেও আর সময় লাগে না। ব্যস, যা হবার তাই হয়। সমস্ত চোখ-মুখ গোধূলির রাঙা মেঘের মতো লাল হয়ে যায়।

শ্রেয়ার এই লজ্জায় আড়ষ্ট অবস্থা দেখে, বিছানায় শুয়ে সেলিম দ্রুত বলে, 'এই, কী হয়েছে রে তোর, বৈশাখী ? ইচড়ে পাকার মতো কথা বলছিস কেন ?'

বৈশাখী এত সহজে দমে যাওয়ার মতো মেয়ে নয়। সে একইরকম বলে, 'না, ভাইয়া। সে রকম কিছু নয়। ভূত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল, এই আর কী। ভূতে ধরলে কী করতে হবে, সে কথাই আলোচনা করছিলাম আমরা দু'জনে। আলোচনার ফলাফল অবশ্য একটাই। ভূতে ধরলে হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারি, কবিরাজি কোনও কিছুতেই কোনও কাজ হবে না। ওঝা চাই, ওঝা। তাও আবার যেন-তেন প্রকারের ওঝা হলে কিন্তু চলবে না। বেশ ভাল তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক জানা একজন ওঝা চাই, বুঝেছ ভাইয়া ? তবে শ্রেয়া আপুর মতো অপূর্ব সুন্দরী কোনও ওঝা যদি হয়, তাহলে তো কথাই নেই।'

শ্রেয়া এতটাই লজ্জা পায় যে, চোখ তুলে আর তাকাতে পারে না।

সেলিম বলে, 'বিছানায় শুয়ে আছি তো, তাই যা-না তাই এক নাগাড়ে ফড়ফড় করে বলে যাচ্ছিস। যদি হাতের কাছে পেতাম, তো বুঝতি পাজি

মেয়ে। কান টেনে ছিঁড়ে, একেবারে হাতে ধরিয়ে দিতাম।'

সেলিমের কথা শুনে, বৈশাখী খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'ও আর নতুন কী। ছেলেবেলা থেকেই তো তোমার হাতের যত সব মজার এবং মিষ্টি কানমলা খেয়ে যাচ্ছি আমি।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই, ডাক্তার নার্সসহ কেবিনে এসে উপস্থিত হন। গম্ভীরমুখো ডাক্তার কেবিনে ঢুকেই কোনও দিকে না তাকিয়ে, সোজা সেলিমের বেডের সামনে এগিয়ে যান। প্রেসার মাপার যন্ত্র নিয়ে ব্লাড প্রেসার মেপে, পাল্‌স দেখে নার্সকে নিচু গলায় কী যেন বলেন।

ঠিক এ সময় আফজাল হোসেন ও মরিয়ম বেগম কেবিনে এসে ঢোকেন।

আফজাল হোসেন ডাক্তারকে দেখেই বলেন, 'এখন কেমন আছে আমার ছেলে, ডাক্তার সাহেব ?'

ডাক্তার থার্মোমিটারে সেলিমের শরীরের উত্তাপ দেখেন। কেন যেন উদ্বিগ্ন আফজাল হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলেন না।

ডাক্তার কিছু বলছেন না দেখে, আফজাল হোসেন ভেতরে-ভেতরে যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি আবার বলেন, 'আমাদের খোকা ভাল আছে তো, ডাক্তার ?'

নার্স ও ডাক্তার নিচুস্বরে কী যেন বলাবলি করেন। না, ডাক্তার এবারও কিছু বলেন না।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা বৈশাখী, এবার শ্রেয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'খোকা কে, জানেন তো ? জি না, বাড়িতে কেউ ভাইয়াকে তার নাম ধরে ডাকে না। বাবা-মা তাদের একমাত্র ছেলেকে আদর করে ডাকেন, খোকা। আমি বলি, ভাইয়া। এবার তো বুঝতে পারছেন, বাবা কাকে খোকা বলেছেন ?'

বৈশাখীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রেয়া একইরকম নিম্নস্বরে বলে, 'হ্যাঁ।'

রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তার নার্সসহ কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক এ সময় আফজাল হোসেন কিছু বলার আগেই উৎকণ্ঠিত মরিয়ম বেগম বলেন, 'কেমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব ?'

মরিয়ম বেগমের কথার উত্তরে, দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়ান ডাক্তার। খানিক কী যেন ভাবেন ! তারপর বলেন, 'টেমপারেচার একটু বেড়েছে। হঠাৎ টেমপারেচার বেড়ে গেল কেন, বুঝতে পারছি না।'

ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই, ব্যাকুল মরিয়ম বেগম আবার বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, খোকা ভাল হবে তো ? ভয়ের কিছু নেই তো, বলেন ?'

গম্ভীরমুখো ডাক্তার কেন যেন মাথা তুলে, এক পলক উৎকণ্ঠিত মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে তাকান। তারপর ধীরে-ধীরে বলেন, 'ভাববেন না। আমরা চেষ্টার একটুও ত্রুটি করব না। আমাদের সাধ্যমতো আমরা সবই করব।'

কথা শেষ করে ডাক্তার আর দাঁড়ান না। নার্সসহ চলে যান।

ডাক্তার চলে যেতেই মরিয়ম বেগম ছুটে ছেলের বেডের পাশে গিয়ে, ছেলের মাথায় দ্রুত হাত রাখেন।

মাথায় হাত রেখেই চমকে ওঠেন তিনি। হ্যাঁ, তাইতো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

মরিয়ম বেগম দ্রুত বলেন, 'খুব কি কষ্ট হচ্ছে বাবা ?'

চোখ দুটো বন্ধ করে ছিল। ধীরে-ধীরে দু'চোখ খুলে, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে সেলিম বলে, 'আমি ভাল আছি মা। তুমি চিন্তা করো না তো।'

বিছানায় শায়িত ছেলের চোখ-মুখে, পরম স্নেহে আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে মরিয়ম বেগম বলেন, 'ছেলের জন্যে মা চিন্তা করবে না, তা কি হয় বাবা, বল ?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল বৈশাখী। এতক্ষণ চুপচাপ থাকা তার স্বভাব নয়। তাই এবার মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতেই বলে, 'একটা কথা কি বলতে পারি মা ?'

মরিয়ম বেগম সেলিমের মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'বড় অনুমতি চাইছিস যে ? কী বলবি ঝটপট বলতে পারিস না ?'

বৈশাখী স্বভাবসুলভ হাসি-হাসি মুখ করে বলে, 'শোনো মা, একটা কথা বলি শোনো। ভুলবশত আজরাইল যদি ভাইয়ার জান কবচ করার জন্যে এই কেবিনের ভেতরে চুপি-চুপি ঢুকেও থাকে, তোমার এত স্নেহ-ভালবাসা দেখে নির্ঘাত পড়ি-কী-মরি করে কেবিন থেকে ছুটে পালাবে।'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর কথা শেষ হতে বলেন, 'কী বলছিস তুই ? মা তার ছেলেকে ভালবাসবে না, না ?'

বৈশাখী হাসিমুখ করে বলে, 'আমিও তো তোমার সন্তান, নাকি ? কই, তোমার অবশিষ্ট এই সন্তানের জন্যে এত দরদ, এত ভালবাসা তো কখনও আমি দেখিনি। তাই বলছিলাম কী মা—'

কথা শেষ করতে পারে না। তার আগেই আফজাল হোসেন বলেন, 'অবশিষ্ট সন্তান কী রে ? এই, অবশিষ্ট সন্তান বলছিস কেন তুই ? সন্তান তো সন্তানই। তার আবার অবশিষ্ট কী রে বৈশাখী ?'

সবার সঙ্গে সমান তালে কথা বলতে পারলেও, একমাত্র এই বাবার সঙ্গে সাহস করে কখনওই কথা বলতে পারে না। তাই কী আর করে, এবার আর মুখ খোলে না। চুপ করে থাকে।

শ্রেয়ার কিন্তু একনাগাড়ে বকবক করা মুখরা মেয়ে বৈশাখীকে ভালই লাগে। মুখে যা আসে, তাই বলে। কোনওই ঘোরপ্যাঁচ নেই।

বৈশাখীকে নিয়ে শ্রেয়ার এটা-ওটা ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই, বৈশাখী এবার শ্রেয়ার একটা হাত ধরে বলে, 'একটু বাইরে আসুন তো। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, শ্রেয়া আপু।'

কথা শেষ করে শ্রেয়া কী বলে, তা শোনার জন্যে অপেক্ষাও করে না সে। হাত ধরে টেনে বাইরের নির্জন করিডোরে এনে, মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বৈশাখী বলে, 'আপনাকে আমি একটা কথা বলব। কিছু মনে করবেন না তো, শ্রেয়া আপু?'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলেন, 'না। কিছু মনে করব না। তুমি বলো?'

শ্রেয়ার 'তুমি বলো' বলার পরও এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে! খানিক ভেবে তারপর বলে, 'কী ভাবে কথাটা শুরু করব, বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। তাই হাসে। হেসে বলে, 'বলেছি তো, আমি কিছু মনে করব না। তুমি বলো, বৈশাখী?'

না, মাথা তুলে কেন যেন আর শ্রেয়ার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। মাথা নিচু করেই কোনওমতে বলে, 'আপনি কি ভাইয়ার চোখে-মুখে কখনও কিছু দেখেছেন, শ্রেয়া আপু?'

শ্রেয়া বুঝতে পারে না কী বলছে। তাই দ্রুত বলে, 'কী দেখব!'

'না, বলছিলাম যে, ভাইয়ার চোখে-মুখে কোনও আলো বা কিছু কি আপনি দেখেছেন?'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা শুনে, যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'কই, না তো। আমি কিছু দেখিনি তো বৈশাখী।'

না। এবারও মাথা তুলে তাকাতে পারে না। মাথা নিচু করে কোনওমতে বলে, 'আপনি যতক্ষণ আসেননি, বার-বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। মুখটা শুধু অন্ধকার হয়ে ছিল। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে করে যখনই আপনি দরজা দিয়ে ঢুকলেন, ব্যস, মুখ থেকে সব অন্ধকার কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে! অন্ধকার মুখটা একেবারে হাসি-খুশিতে ভরে গেল। বিশ্বাস করুন আপু, দেখে আমার কী যে ভাল লাগল, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'কেন ! ভাল লাগল কেন !'

এই প্রথম মাথা তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'বারে, আমার যে ভাই পারতপক্ষে কোনও মেয়ের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি কখনও, মেয়েদের কাছ থেকে সব সময় পালিয়ে থেকেছে, তার হঠাৎ আজ এই প্রথম একজনকে দেখে ভাল লাগছে। ভাল লাগবে না আমার, বলুন ?'

ব্যস, কোথা থেকে এত জড়তা, এত লজ্জা এসে ভর করে, নিজেও বুঝতে পারে না শ্রেয়া। চোখ তুলে আর কিছুতেই তাকাতে পারে না। তাই দ্রুত বলে, 'ইয়ে মানে, আমি বলছিলাম কী বৈশাখী—'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না শ্রেয়া। তার আগেই বৈশাখী বলে, 'আমার ভাইয়ের এমন সৌভাগ্য কি হবে, শ্রেয়া আপু ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'তুমি কী বলছ, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না বৈশাখী।'

বৈশাখী বলে, 'যাকে ভাল লেগেছে, তাকে কি এ জীবনে পাবে আমার ভাইয়া ?'

কী বলবে শ্রেয়া ! বৈশাখীর এ কথা শুনে এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, হতচকিত শ্রেয়া মাথা নিচু করে কেবল এদিক-ওদিক তাকায়। কিছুই বলতে পারে না।

বৈশাখী থেমে থাকার মেয়ে নয়। সে থেমে থাকেও না। সে আবার বলে, 'কই, কিছু বললেন না, শ্রেয়া আপু ?'

শ্রেয়া মাথা নিচু করে বলে, 'কী বলব ?'

বৈশাখী কী ভেবে খানিক শ্রেয়াকে দেখে। তারপর আবার বলে, 'আপনি কি আমার ভাবী—'

বুঝতে পারে, আপনি কি আমার ভাবী হবেন, বলতে চায় বৈশাখী। ব্যস, আর বলতে দেয় না। বাধা দিয়ে শ্রেয়া বলে, 'ভেতরে চলো, বৈশাখী। তোমার ভাইয়া অসুস্থ।'

শ্রেয়ার এ কথার পর, বৈশাখী কেন যেন আর কিছু বলে না। দু'জনে কেবিনের দিকে পা বাড়ায়।

রাতের দিকে জ্বর আরও বেড়ে যায় সেলিমের।

বাসা থেকে টেলিফোন করে এ খবর পেয়ে, আর বাসায় বসে থাকতে পারে না। রাত একটা কী সোয়া একটার দিকে একা একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে বাসাবো থেকে, এত দূরে পান্থ পথে ক্লিনিকে চলে আসে শ্রেয়া।

শ্রেয়াকে এত রাতে এভাবে ক্লিনিকে আসতে দেখে, বৈশাখী যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'প্রতি পনেরো মিনিট পর-পর তো টেলিফোন করে খবর নিচ্ছিলেন। ভাবলাম, সারারাত বুঝি ঘুমাবেন না, শুধু টেলিফোনে খবরই নেবেন। এখন দেখি, সশরীরে এসে হাজির !'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'ভাবলাম, হঠাৎ জ্বরটা বিকেল থেকে শুরু হল। এখন আরও বেড়ে গেল।'

বৈশাখী শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে, খানিক কী যেন ভাবে! তারপর বলে, 'না শ্রেয়া আপু, কাজটা আপনি ভাল করেননি। এত রাতে আপনার এভাবে আসা সত্যি উচিৎ হয়নি।'

'আমি আসলে বৈশাখী—'

কী যেন বলতে চায় শ্রেয়া, কিন্তু পারে না। তার আগেই বৈশাখী স্বভাবসুলভ বলে, 'আপনি আসলে কী আমি কি বলব, শ্রেয়া আপু ?'

বৈশাখীর এ প্রশ্নের উত্তরে, শ্রেয়া কেন যেন কিছু বলতে পারে না। ড্যাবড্যাব করে কেবল তাকিয়ে থাকে।

বৈশাখীও যে শ্রেয়ার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তা নয়। সে একইরকম বলে, 'অল্প বয়সী নতুন ডাক্তার হলেও, আপনার অসুখ কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি। অসুখ মানে যেন-তেন কোনও অসুখ কিন্তু নয়। হ্যাঁ, ডেঙ্গু জ্বরের মতো ভয়ানক একটা অসুখ বাঁধিয়ে বসেছেন আপনি। এ অসুখের নাম প্রেম রোগ।'

শ্রেয়া বাধা দেয়। দ্রুত বলে, 'ধ্যাৎ, এসব তুমি কী বলছ বৈশাখী।'

বৈশাখী হাসে। সে হেসে বলে, 'যাহা বলিব, সত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। শ্রেয়া আপু, সত্যি বলছি আপনি ডুবেছেন।'

কী ভেবে শ্রেয়া এবার আর কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে।

শ্রেয়াকে চুপচাপ দেখে যে থেমে থাকে বৈশাখী, তাও নয়। বলে, 'ডুবেছেন মানে বুঝতে পারছেন না ? ডুবেছেন মানে, একেবারে অথৈ পানিতে ডুবে মরেছেন।'

না। শ্রেয়া এবারও কিছু বলে না। কেবল হাসি-হাসি মুখ করে বৈশাখীকে দেখে। অনর্গল এত কথা বলছে, তবু কেন যেন যতই দেখে ততই বৈশাখীকে ভাল লাগে তার।

শ্রেয়া মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না দেখেও যে দমে যায়, তা নয়। বরং একইরকম বলে, 'তবে হ্যাঁ, ঘাবড়ে যাওয়ার কিংবা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

এবার আর চুপ করে থাকে না। মুখ খোলে শ্রেয়া। হেসে বলে, 'কেন ? ভয় পাব না কেন বৈশাখী, বলো ? অথৈ পানিতে ডুবে মরব বলছ। তবু ভয় পাব না, বলো ?'

হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, বলেছি তো, ভয়ের কিছু নেই। শোনেননি, প্রেমের মরা জলে ডুবে না। মরেছেন তো কী হয়েছে ? ভেসে তো থাকবেন। কিছুতেই ডুববেন না।'

দু'জনের কথার মধ্যে একটা গোঙানির মতো শব্দ শুনে, দু'জনে সেলিমের দিকে তাকায়।

গোঙানির মধ্যে সেলিম অনেক কষ্টে বলে, 'শুনুন !'

শ্রেয়া বুঝতে পারে, তাকে ডাকছে। তবু কেন যেন সেলিমের ডাক শুনেই এগিয়ে যেতে পারে না। একরাশ লজ্জা এসে ভিড় করে চোখে, মুখে, সর্বত্র।

বৈশাখী মুচকি হেসে আড়চোখে শ্রেয়াকে দেখে। কিছু বলে না।

সেলিম কষ্ট করে আবার বলে, 'শুনুন !'

না। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ধীরে-ধীরে সেলিমের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

জ্বরের ঘোরে লাল হয়ে যাওয়া দুটো চোখ তুলে সেলিম অস্ফুট স্বরে বলে, 'আপনি কখন এসেছেন ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'এই তো, এখনই এলাম।'

সেলিম একইরকম অস্ফুট স্বরে বলে, 'এত রাতে আবার কেন এসেছেন ! একা এসেছেন ?'

শ্রেয়া মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই, সেলিম অস্ফুট বলে, 'ঠিক করেননি।'

শ্রেয়া দেখে বৈশাখী মুচকি হেসে, তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কী ভেবে শ্রেয়া কিছু বলে না। চুপ করে থাকে।

সেলিমই আবার বলে, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'ঠিক আছে, মনে করব না। আপনি বলুন।'

সেলিম কেন যেন আর শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'যদিও রাত গভীরে আপনার এভাবে আসাটা আমার পছন্দ হয়নি, তবু একটা সত্যি কথা না বললেই নয়। এত জ্বর, এত যন্ত্রণার মধ্যেও আপনি আসাতে ভাল লাগছে আমার। শুধু ভাল লাগছে বললে কম বলা হবে। এত ভাল লাগছে যে—'

না। সেলিমকে আর কথা শেষ করার সুযোগ দেয় না শ্রেয়া। দ্রুত বলে, 'থাক। আর বলতে হবে না।'

কথা শেষ করে, বৈশাখীর দিকে তাকায় শ্রেয়া। দেখে বৈশাখীর চোখ-মুখ জুড়ে এক টুকরো রহস্যময় হাসি ঝুলে আছে।

ঠিক এ সময় নার্স কেবিনে এসে ঢোকে। নার্স কেবিনে ঢুকেই জ্বরের প্রকোপ দেখার জন্যে, সেলিমের জিহ্বার নীচে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিয়ে মিনিট খানিক অপেক্ষা করে। তারপর থার্মোমিটার বের করে জ্বর কত দেখে।

নার্সের জ্বর দেখা হতেই শ্রেয়া বলে, 'জ্বর কি খুব বেড়েছে?'

নার্স সংক্ষেপে বলে, 'হ্যাঁ। হঠাৎ কেন যে জ্বর বেড়ে গেল, ডাক্তাররাও বুঝতে পারছেন না।'

উদ্বিগ্ন শ্রেয়া নার্সের কথা শেষ হতেই আবার বলে, 'এখন জ্বর কত?'

নার্স কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবে বলে দরজার দিকে কয়েক পা বাড়িয়েও, শ্রেয়ার কথা শুনে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'ঘণ্টা খানেক আগে জ্বর একশ' তিন ডিগ্রি ছিল। এখন একটু হলেও কমেছে। এখন একশ' দুইয়ের মতো।

কথা শেষ করেই নার্স চলে যায়।

নার্স চলে যেতেই, শ্রেয়া বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার মনে হয়, জ্বর কমতে শুরু করেছে। তুমি কি বলো, বৈশাখী?'

শ্রেয়ার কথা শুনে, বৈশাখী স্বভাবসুলভ হেসে বলে, 'কমতেই হবে। তা কেন কমতে হবে, বলব শ্রেয়া আপু?'

শ্রেয়া বুঝতে পারে না বৈশাখী কী বলতে চায়। সে দ্রুত বলে, 'বলো ?'

বৈশাখী ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাইয়ার কাছে আছি। কিন্তু জ্বর কমেনি, কেবল বেড়েছে। কিছুক্ষণ আগে সুদূর বাসাবো থেকে, একজন এসে ঢুকলেন এই কেবিনে। ভাইয়া তাকে দেখল। ব্যস, আর যায় কোথায় ! জ্বরও কমতে শুরু করল।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই শ্রেয়া হেসে বলে, 'ধ্যাৎ, কী যে বলো তুমি বৈশাখী, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি এলাম, আর জ্বর কমে গেল !'

বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ। কমে গেল তো। আপনি অস্বীকার করলেও, বিষয়টা কিন্তু মিথ্যে নয়।'

সেলিমের পক্ষে আর বোধহয় চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। কষ্ট করে হলেও সে বলে, 'পুঁচকি মেয়েটার মুখে কোনও লাগাম নেই, বুঝেছেন ? আপনি কিছু মনে করবেন না, শ্রেয়া। বাবা, মা আর আমার আদর পেয়ে-পেয়ে মেয়েটা এমন হয়েছে। এই বৈশাখী, পাজী মেয়ে কোথাকার, একনাগাড়ে বকবক করছিস। আর এখন এসব কী বলছিস তুই, বল তো ?'

সেলিমের কথা শুনে, বৈশাখী দ্রুত বলে, 'কই, আমি তো কিছুই বলছি না। আমি আর শ্রেয়া আপু একটু এটা-ওটা গল্প করছিলাম, এই আর কী।'

সেলিমের এত জ্বরের মধ্যে কথা বলতে সত্যি কষ্ট হচ্ছে। তবু বলে, 'একে গল্প করা বলে, তাই না ?'

সেলিমের প্রশ্নের জবাবে, বৈশাখী কিছু বলার আগেই শ্রেয়া বলে, 'বৈশাখী খুব ভাল মেয়ে। আমার কিন্তু ওকে খুব ভাল লেগেছে।'

শ্রেয়ার কথা শুনে বৈশাখী একগাল হেসে বলে, 'শুনেছ তো ভাইয়া, নাকি শোনোনি ? আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে– বড় সেই হয়। জি না ভাইয়া, আমি কিন্তু নিজে নিজের প্রশংসা করছি না। লোকেই এখন আমার প্রশংসা করা শুরু করছে, বুঝেছ ?'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া হাসে।

শ্রেয়াকে হাসতে দেখে সেলিম বলে, 'আপনি হাসছেন, শ্রেয়া ? এই পাজী নচ্ছার মেয়েটার বকবক শুনে কি না আপনি হাসছেন ? কী যে বলতে ইচ্ছে করছে আমার, কী বলব ! বিছানায় শুয়ে ওর এসব ইঁচড়েপাকা কথা শুনে, আমার রাগে—'

না। সেলিমকে আর কথা শেষ করতে দেয় না। মুখ থেকে বাজপাখির মতো কথা কেড়ে নিয়ে বৈশাখী বলে, 'তোমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, এই তো ?

শোনো ভাইয়া, রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, নাকি জ্বরে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে, সেটা এখন থাক। কথা হচ্ছে গিয়ে, তুমি অসুস্থ। অনেক রাত হল, তুমি এখন ঘুমাও।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বলে, 'আমি ঘুমাব এটা ঠিক আছে। কিন্তু শ্রেয়ার কী হবে, তুই বল ? শ্রেয়া না ঘুমিয়ে সারারাত জেগে থাকবে নাকি ?'

সেলিমের শ্রেয়ার জন্যে এভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া দেখে বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'সত্যি ভাইয়া, মাত্র দু'-একদিনের মধ্যে তুমি এতটাই পাল্টে গেলে কী করে, বুঝতে পারছি না।'

সেলিম বৈশাখীর কথা বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'পাল্টে গেছি মানে ! কী বলছিস তুই !'

বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'আমি তোমার বোন, ঠিক কি না বলো ?'

বৈশাখীর কথা শুনে, সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'এই বৈশাখী, মাথা খারাপ হয়নি তো তোর ! এসব কী প্রশ্ন করছিস, বল তো ?'

না। এবার আর হাসে না। কৃত্রিম অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। তুমি বললেও আমি তোমার বোন, না বললেও বোন। সেই মায়ের পেটের একমাত্র বোন কোথায় ঘুমাবে, ঘুমাবে কী ঘুমাবে না— ভেবেছ একবার ! অথচ দু-তিন দিনও হয়নি, একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তার ঘুমের জন্যেই কি না তোমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে! সত্যি ভাইয়া, কী আর বলব তোমাকে ! আর আপনাকেও বলি শ্রেয়া আপু, এত বেশি সুন্দরী হওয়ার কী দরকার ছিল আপনার, বলুন তো ?'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া থতমত হয়ে বলে, 'তার মানে ! তুমি কী বলছ বৈশাখী, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই বৈশাখী বলে, 'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি আমি। মানুষ তো মানুষের মতো সুন্দর হবে, নাকি ? ছবির মতো সুন্দর হবে কেন, বলেন ? আপনি এত বেশি সুন্দরী হওয়ার ফলে কী হয়েছে, আপনিই বলেন ? আমার সাদাসিধা গোবেচারা সবেধন নীলমণি ভাইয়ার মাথার গভীরে মগজের মধ্যে, এখন এই একজন রূপসী ছাড়া আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।'

একটানা কথা বলে, মুচকি হেসে এবার শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা শুনবেন নাকি সেই রূপবতী-গুণবতীর নাম ? হ্যাঁ। বলছি শুনুন, সেই অনিন্দ্য সুন্দরী আর কেউ নয়, সেই ভাগ্যবতী হচ্ছেন—'

মুখের কথা এবার আর শেষ করতে পারে না বৈশাখী। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রেয়া বলে, 'না বৈশাখী, না। আবোল-তাবোল কিছু বলবে না তুমি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে বৈশাখী শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকায়। দেখে শ্রেয়ার চোখে-মুখে কোথাও হাসির লেশমাত্র নেই। হঠাৎ এত গম্ভীর কেন, বুঝতে পারে না বৈশাখী।

অবাক হয়ে বৈশাখীকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকতে দেখে, শ্রেয়া দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'বৈশাখী, ওনার এখন ঘুমানো দরকার। চলো, আমরা দু'জনে বারান্দায় গিয়ে চেয়ার নিয়ে বসি।'

শ্রেয়ার কথা শুনেও বৈশাখী একইরকম বলে, 'বাপরে, পরিচয় হতে না হতেই এত দরদ ! একটা কথা বলব, শ্রেয়া আপু ?'

'বলো ?'

'আমার ভাই। শুধু ভাই নয়, আমার ওয়ান পিস ভেরি ব্রিলিয়ান্ট ভাই। সেই ভাইয়ের ঘুমের জন্যে একমাত্র বোন হিসেবে, আমার আগে দুশ্চিন্তা হচ্ছে কি না আপনার ! স্যরি, শ্রেয়া আপু। আই এ্যাম ভেরি স্যরি।'

বৈশাখীর কথা শুনে, গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়। দ্রুত বলে, 'কেন ? দুঃখিত হবে কেন তুমি ? রাত অনেক হয়েছে। ওনার টেমপারেচারও বেড়ে গেছে। ঘুম দরকার। উনি ঘুমাবেন না, বলো ?'

শ্রেয়ার কথার উত্তরে, কী বলবে ভাবছিল বৈশাখী। কিন্তু তার আগেই দেখে, সেলিম বিছানায় বসে বমি করছে। বৈশাখী যাওয়ার আগেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রেয়া ছুটে গিয়ে, দু'হাতে সেলিমকে ধরে।

সেলিম বমি করে। শ্রেয়া দু'হাতে বুকের মধ্যে নিজের অজান্তেই সেলিমকে জাপটে ধরে রাখে।

বমি করা থামতেই জগ থেকে জল ঢেলে এক গ্লাস জল, সেলিমের মুখের সামনে তুলে ধরে শ্রেয়া। জল খাওয়া হলে পরম যত্নে, এবার তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দেয়।

যা হওয়ার তাই হয়। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রাখার কারণে, বমির অনেকটাই গিয়ে পড়ে শ্রেয়ার শাড়ি-ব্লাউজে।

শ্রেয়ার এ অবস্থা দেখে সেলিম দ্রুত বলে, 'আপনি কেন ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, বলুন তো ?'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'বারে, আপনি বমি করছিলেন। আপনাকে আমি ধরব না ? না ধরলে আপনি যদি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যেতেন, তাহলে ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'বৈশাখী ছিল। সে ধরত। বলছিলাম, আপনি খামোখা ছুটে এসে নিজের শাড়ি-ব্লাউজ সব নষ্ট করলেন কেন, বলুন তো ?'

একটু আগে জমে থাকা মুখের সব গাম্ভীর্য কোথায় সব উধাও হয়ে যায়, কে জানে ! শ্রেয়া হেসে বলে, 'খামোখা ছুটে এসে আপনাকে ধরে, নিজের শাড়ি-ব্লাউজ সব বমিতে ভর্তি করে ফেলেছি, এই তো ? আর আপনি ? মনে নেই আপনার, খামোখা ছুটে গিয়ে গুলি খেয়ে শার্ট-প্যান্ট সব নিজের তাজা রক্তে ভর্তি করে ফেলেছিলেন ?'

অনেকক্ষণ ধরে চুপ থেকে দু'জনের কথা শুনছিল বৈশাখী। এতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেও, আর চুপ থাকতে পারে না। এবার দু'জনের কথার মাঝখানে বলে, 'বুঝেছি। আর বলতে হবে না। কে বমিতে, আর কে রক্তে ভিজছে এবং কেন ভিজছে, সে তর্ক এখন থাক। তারচে' চেয়ে দেখুন শ্রেয়া আপু, আপনার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। আপনারই শাড়ির পরতে-পরতে আজ গুলিবিদ্ধ এক যুবকের বমির আলপনা।'

থামে। খানিক থেমে আবার বলে, 'তা এভাবে বসে থাকলে তো হবে না।'

কথা বলতে-বলতে সেলিমের শিয়রে বসা শ্রেয়ার একটা হাত ধরে, বৈশাখী বলে, 'চলুন, শ্রেয়া আপু। জলদি চলুন।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা শুনে অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় যাব ?'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'বারে, এই দুর্গন্ধ মেখে বসে থাকবেন নাকি ? আসুন। সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকুন।'

বৈশাখীর কথা শুনে, শ্রেয়া খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'কিন্তু আমি তো একবস্ত্রে এসেছি বৈশাখী। গোসল করে পরব কী ?'

বৈশাখী হাসে। খিলখিল করে হেসে বলে, 'শাড়ি-ব্লাউজ তো ? লাগ ভেল্কি লাগ, চোখে-মুখে লাগ বললেই, শাড়ি-ব্লাউজ, পেটিকোট সব হাজির হয়ে যাবে।'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'আছে নাকি তোমার কাছে শাড়ি-ব্লাউজ ?'

হাত ধরে এবার কেবিনের এককোণে টেনে এনে, একটা মাঝারি সাইজের প্লাস্টিকের ঝুড়ি দেখিয়ে বৈশাখী হাসিমুখে বলে, 'কতদিন লাগবে না লাগবে ঠিক নেই তো, মা তাই বেশ ক'টা সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি-ব্লাউজ ঠেসে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যান। গোসল করে এই অধম বালিকার এক বা একাধিক যে কোনও বস্ত্র পরিধান করে আসুন।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'না, হয়নি। ভুল বলেছ। তুমি তো এখন আর বালিকা নও। তুমি তো স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে এসেছ। তোমাকে তো এখন আর বালিকা বলা যায় না।'

বৈশাখী দমে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, শ্রেয়া আপু। বালিকা নই। আমি হচ্ছি খুকী, কচি খুকী, বুঝেছেন ? নাক টিপলে এখনও আমার দুধ বেরুবে। দেখুন, এই দেখুন আপনি।'

বৈশাখী হেসে নিজের নাক দেখায়।

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই, বিছানায় শুয়ে থেকে অনেকক্ষণ পর সেলিম এবার বলে, 'ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। ঐ মুখরা মেয়েটার সঙ্গে কথায় আপনি কিছুতেই পেরে উঠবেন না, বুঝেছেন ? ঐ চাপাবাজ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে অনর্থক সময় নষ্ট না করে, আপনি আগে বাথরুমে যান তো। আপনার আগে এখন গোসল করে ফ্রেস হওয়া দরকার, শ্রেয়া।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই, বৈশাখী হাত বাড়িয়ে মাঝারি সাইজের প্লাস্টিকের ঝুড়িটা হাতে নিয়ে বলে, 'এই নিন, ধরুন। যান, গোসল করে আসুন শ্রেয়া আপু।'

শ্রেয়া হেসে ঝুড়িটা হাতে নিয়ে, কেবিন সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢোকে।

বৈশাখী যে থেমে থাকে, তা নয়। ভাই-বোনের সম্পর্কটা এমনিতে এতই রাখঢাকহীন আন্তরিক যে, দু'জন দু'জনকে অনেক কথাই বলতে পারে। শ্রেয়া বাথরুমে চলে যেতেই বৈশাখী সেলিমের শিয়রে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'একে কী বলে, জানো ভাইয়া ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কী ?'

বৈশাখী হাসে না। চোখে-মুখে নকল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বলে, 'একে বলে– পড়বি তো পড়, মালির ঘাড়ে, বুঝেছ ?'

বৈশাখীর কথা সেলিম বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'তার মানে ! কী বলছিস তুই, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৈশাখী একইরকম গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে, 'সত্যি, আমি তো দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

সেলিম বৈশাখীর কথা শুনে দ্রুত বলে, 'কেন ! তুই অবাক হচ্ছিস কেন, বল !'

বৈশাখী অনেকক্ষণ পর এবার হাসে। একগাল হেসে বলে, 'শেষ পর্যন্ত বমিটাও করলে কি না ঐ শ্রেয়া আপুরই গায়ে ? তাই বলছিলাম– পড়বি তো পড়—'

বৈশাখীকে তার কথা শেষ করতে দেয় না। থামিয়ে দিয়ে সেলিম বলে, 'খুব চালাক হয়েছিস, না ?'

কথা শেষ করে যে চুপ করে থাকে, তা নয়। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশাখীর একটা কান মলে দেয়ার জন্যে হাত বাড়ায় সেলিম।

কিন্তু বৈশাখীর নাগাল পায় না। দ্রুত সরে গিয়ে বৈশাখী বলে, 'তুমি তো রাতদিন আমাকে বলো ভাইয়া, আমি একটা বোকার হদ্দ। আমি একটা গাধা মেয়ে।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বলে, 'তুই বোকাই তো। গাধাই তো। তুই বোকা-গাধা মেয়ে না হলে, শ্রেয়াকে এসব তুই একনাগাড়ে কী বলছিস, বল তো ? তোর হড়হড় করে বলা এসব কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে আছেন উনি, দেখছিস না ?'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই, শ্রেয়া গোসল করে বৈশাখীর একটা নীল রঙের শাড়ি পরে কেবিনে এসে দাঁড়ায়। ভেজা চুলে সদ্য গোসল করা শ্রেয়াকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগে।

না। দু'চোখ আর ফেরাতে পারে না। মুগ্ধ দু'চোখে তাকিয়ে থাকে সেলিম। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল বলতেও পারবে না। শ্রেয়ার কথা শুনে হুঁশ হয়।

শ্রেয়া বলে, 'ভোর হয়ে এল। আপনি অসুস্থ। না ঘুমালে শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। আপনি এখন ঘুমান।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম কিছু বলার আগেই, বৈশাখী বলে, 'কী ভাবে ঘুমাবে, বলো ? যেভাবে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, চোখ বুজতে পারলে তো ঘুমাবে ?'

বৈশাখীর কথা শুনে, শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'চলো, বৈশাখী। আমরা বারান্দায় গিয়ে বসে গল্প করি। তোমার ভাইয়া একটু ঘুমাক।'

শ্রেয়া বৈশাখীকে আর কিছু বলতে দেয় না। হাত ধরে টেনে বারান্দায় এনে, মুখোমুখি দু'টি চেয়ারে বসে হাসি মুখে বলে, 'এবার বলো, তোমার হাড়িতে কত খোশগল্প আছে, সব বলো। আমি শুনব।'

শ্রেয়ার হাসি মুখে বলা কথা শুনে, বৈশাখীও হাসে।

পনেরো কী ষোল দিনের মধ্যেই সেলিম ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে।

মরিয়ম বেগমসহ সকলের চোখে-মুখে এ ক'দিন ধরে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ছায়া দুলছিল, সেলিম অল্প-অল্প করে সুস্থ হতে থাকার সঙ্গে-সঙ্গে তা দূর হয়ে যায়।

তবে সেলিম আবার সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে, সবচে' বেশি যে খুশি হয়, সে শ্রেয়া। শ্রেয়ার খুশির যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না।

শ্রেয়া নিজেও বুঝতে পারে না, গুলিবিদ্ধ সেলিম আবার সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে, এত ভাল লাগছে কেন তার !

তাহলে কি... ? না। এ রঙিন স্বপ্ন মনের মধ্যে যতই উঁকি দেবে দিক, তবু এ স্বপ্ন দেখতে চায় না সে। বামন হয়ে আকাশে হাত বাড়ালেই তো হবে না। কী অধিকার আছে তার সেলিমকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার ? কোথায় সে, আর কোথায় সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া মেধাবী সেলিম !

শ্রেয়া শুধু সুন্দরী নয়, অনিন্দ্য সুন্দরী, এটা সে নিজেও জানে। সেলিম শুধু ভাল লাগার দৃষ্টিতে নয়, যার-পর-নাই মুগ্ধ চোখে তার দিকে কেবল তাকিয়ে থাকে। শ্রেয়া মেয়ে হয়ে এ আগুনঝরা মুগ্ধ দৃষ্টি চিনবে না, তা তো নয়। শ্রেয়া বুঝতে পারে, ক্লিনিকে একা পেলেই সেলিম তাকে যেন কিছু বলতে চায় ! কিন্তু বলতে পারে না। গত কয়েক দিন ধরেই সেলিম চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কী বলতে চায় সেলিম ? অজানা আশংকায় ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় যেন সেঁধিয়ে থাকে শ্রেয়া।

আজও এটা-ওটা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে, ভার্সিটি থেকে একটা রিক্সা নিয়ে পান্থপথে ক্লিনিকের সামনে এসে নামে। বিকেল চারটা। হিসেব মতো এখন বৈশাখীর ক্লিনিকে থাকার কথা।

কেবিনে পৌঁছে যদি দেখে, বৈশাখী নেই, তাহলে ? ক'দিন ধরে অনবরত যে কথা বলার জন্যে চেষ্টা করছে সেলিম, তাকে একা পেয়ে সে কথা যদি আজ মুখ ফুটে বলে ফেলে, তাহলে !

কেবিনে পৌঁছে দেখে, যা ভেবেছে ঠিক তাই। বৈশাখী আসেনি।

শ্রেয়াকে কেবিনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেই, সেলিম বলে, 'মনে-মনে ভাবছিলাম, কী হল, এত দেরি হচ্ছে কেন আপনার ! ভাবছিলাম, কোনও অসুবিধা হয়নি তো আবার ?'

শ্রেয়া সেলিমের বিছানার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে হেসে বলে, 'আপনি ভুল করছেন। আমার একটুও দেরি হয়নি। আমি আজ সাড়ে চারটার মধ্যে আসব বলে গিয়েছিলাম। কেবিনে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখনও সাড়ে চারটা বাজতে কিন্তু অনেক দেরি আছে।'

সেলিম দ্রুত দেয়াল ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, 'স্যরি। ভেরি স্যরি। আসলেই ভুল হয়ে গেছে আমার।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া হেসে বলে, 'থাক। আর ভুল স্বীকার করতে হবে না। এখন কেমন আছেন, বলুন ?'

শ্রেয়ার এ প্রশ্নের উত্তরে, সেলিম খানিক আনমনা কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'সত্যি বলব, বলেন ?'

সেলিমের এ প্রশ্ন শুনে শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছেন আপনি ! সত্যি বলবেন না তো, মিথ্যা বলবেন নাকি !'

চোখে-চোখ রেখে আর কথা বলতে পারে না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি এলেই আমি ভাল হয়ে যাই, জানেন ?'

সেলিমের মুখে এ কথা শুনে এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, ফ্যালফ্যাল করে সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না।

সেলিমের আজ কী হয় কে জানে ! সে আবার বলে, 'আমার এ কথা শুনে আপনি কি রাগ করেছেন, শ্রেয়া ? বিশ্বাস করুন, কথাটা সত্যি। আপনি এলে আমার ভাল লাগে। এত ভাল লাগে যে, মনে হয় ভাল হয়ে গেছি আমি।'

কী বলবে শ্রেয়া ! কী-ইবা বলার আছে তার ! কিছু না বলে তাই আগুন পোড়া দু'টি চোখের চাহনির সামনে চুপচাপ বসে থাকে। বলে না কিছুই।

শ্রেয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম আবার বলে, 'আমার কথা শুনে আপনি রাগ করেছেন, শ্রেয়া ? আমি সত্যি কথা বলেছি। আপনি কষ্ট পেয়ে থাকলে, সত্যি আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, আপনি কষ্ট পাবেন জানলে, কথাটা আমি আপনাকে কিছুতেই বলতাম না।'

সেলিমের কথা কি খুব খারাপ লেগেছে তার ? না, একটুও খারাপ লাগেনি। বরং ভাল লেগেছে শ্রেয়ার। এখনও ভেতরে গুঞ্জরিত হচ্ছে সেলিমের

এই সরল স্বীকারোক্তি। অকপটে কী সুন্দর বলল সেলিম, আপনি এলে আমার ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে, মনে হয় ভাল হয়ে গেছি আমি।

সেলিমের এ কথার উত্তরে কিছুই কি বলতে ইচ্ছে করেনি তার ? হ্যাঁ, করেছে। কত কী বলতে ইচ্ছে করেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু বলেনি। আসলে বলার জন্যে যে ক্ষমতা বা সাহস দরকার, তার কোনওটাই তার নেই। কোথায় সেলিম, আর কোথায় সে ! নিজের সম্পর্কে নিজে জানে না শ্রেয়া, তা তো নয়।

স্বপ্ন দেখা ভাল, কিন্তু এতটা অলীক স্বপ্ন দেখা ভাল নয়, এটা জানে শ্রেয়া। তাই সেলিমের ভাল লাগার কথা শুনে ভেতরে হাজার খুশির বীণা বেজে উঠলেও, নিজের মনকে নিজে বোঝায়, শাসন করে।

কী হয় কে জানে ! সেলিম কেন যেন অপলক তাকিয়ে থাকে শ্রেয়ার দিকে। সেলিমের এই অপলক চাহনির সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। আর বৈশাখীর আসার প্রতীক্ষা করে মনে-মনে।

কিন্তু, না। বৈশাখী আসে না। আজ বৈশাখী এত দেরি করছে কেন, বুঝতে পারে না। কেন যেন সেলিমও আর কিছু বলে না।

এভাবে মুগ্ধ দুটো চোখের সামনে চুপচাপ বসে থাকা শুধু কষ্টকর নয়, ভয়ংকর কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে । কী আর করে, শ্রেয়াকেই এবার তাই মুখ খুলতে হয়। হাতের কাছে বলার মতো কোনও যুতসই বিষয় না পেয়ে, শ্রেয়া বলে, 'দুপুরে কী খেয়েছেন আপনি ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম খানিক নিঃশব্দে হাসে। হেসে বলে, 'আপনি হঠাৎ আমার খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, শ্রেয়া ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন ? আপনার খাওয়ার কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না ?'

সেলিম হেসে বলে, 'পারেন। পারবেন না কেন ? একশ' বার পারেন।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া আবার বলে, 'একশ' বারের কোনও দরকার নেই। আপনার খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর আমি একবার নিতে পারি কি না, বলেন ?'

সেলিম হাসি-হাসি মুখ করে এবার বলে, 'হ্যাঁ, পারেন। তবে আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যেই, খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমার মনে হয়, আমার ধারণা ভুল নয়। ঠিক কি না, বলুন ?'

অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকায় শ্রেয়া। এবার আর কিছু বলা তো দূরের কথা, সেলিমের দিকে বড়-বড় দুটো চোখ তুলে তাকাতেও পারে না।

শ্রেয়ার অবস্থা দেখে সেলিম হেসে বলে, 'কী ? হয়েছে কী আপনার, বলুন তো ?'

না। শ্রেয়া এবারও কিছু বলতে পারে না। জড়োসড়ো হয়ে কেবল বসে থাকে।

হাসি-হাসি মুখ করে সেলিম আবার বলে, 'পর-পর দুটো বুলেটবিদ্ধ হওয়ার মানে কী দাঁড়ায়, জানেন না ? পটল তোলা। ইন্নালিল্লাহ্ হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমার এতই ভাগ্য ভাল যে, মরে যাওয়া তো দূরের কথা, একরাশ রঙিন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি।'

ব্যস, কোথা থেকে এত লজ্জা এসে জড়ো হয় চোখে-মুখে, সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে, নিজেও বুঝতে পারে না শ্রেয়া ! কত কী যে বলতে ইচ্ছে করে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। কিন্তু না, কিছুই বলতে পারে না। জড়োসড়ো হয়ে নিচু মাথা আরও নিচু করে বসে থাকে।

শ্রেয়াকে এভাবে লজ্জায় লাল হয়ে বসে থাকতে দেখে সেলিম হেসে বলে, 'এই, আপনার কী হয়েছে বলুন তো ? কী হল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন নাকি ? চেয়ে দেখুন তো আমার দিকে, আমি কি ভয় পাওয়ার মতো কোনও কিছু ? আমাকে কি বাঘ-ভাল্লুকের মতো মনে হয় আপনার ?'

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, 'না সেলিম, না। তেলে-পানিতে কখনও মেশে না। তুমি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারো না। আসমান আর জমিন কখনও মিলতে পারে না।'

কিন্তু, না। সেই একইরকম আড়ষ্ট হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু কিছু বলে না।

সেলিমেরও আজ কী হয় কে জানে ! জীবনে কোনও মেয়ের কাছাকাছি গিয়ে ভাল লাগা বা ভালবাসার কথা বলা তো দূরের কথা, চোখ তুলে কথাও বলতে পারেনি কোনও দিন। সেই মানুষের আজ যেন ঘোর লেগেছে। যেন ঘোরের মধ্যে বলে, 'আমি পরী দেখিনি। পরীরা এরচে' সুন্দর হয় কি না, আমি জানি না। তবে রূপকথার গল্পে রূপসী রাজকন্যার রূপের বর্ণনা পড়ে মনের মধ্যে, রাজকন্যার একটা ছবি আমি এঁকে রেখেছিলাম। বিশ্বাস করুন শ্রেয়া, ভার্সিটিতে আর্টস ফ্যাকালটির সামনে যেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম, মনে হল রূপকথার পাতা থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি।'

একটানা কথা বলে থামে। খানিক থেমে কী যেন ভাবে ! তারপর আবার বলে, 'না। বিশ্বাস করুন, এত সুন্দর জীবনে আর দেখিনি আমি। এখন আমার কি মনে হয়, জানেন ?'

শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'কী ?'

ঘোরলাগা দুটো চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে, সেলিম ধীরে-ধীরে বলে, 'সেদিন চন্দ্রিমা উদ্যানে না গেলে, আমি জীবনে একটা বড় ভুল করতাম। আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে ঢাকাইয়া ছবির হিরোর মতো এগিয়ে না গেলে, আরও একটা ভুল করতাম। গুলিবিদ্ধ না হলেও বড় ভুল হত। কেন এ সব বলছি, প্রশ্ন করতেই পারেন। নইলে আপনি আমাকে এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ক্লিনিকে নিয়ে আসতেন, বলেন ? আপনাকে আমার মনের কথা বলা তো দূরের কথা, আপনার সঙ্গে জীবনে আমার হয়তো কখনও আলাপ-পরিচয়ই হত না।'

ঠিক এ সময় হাসিমুখে বৈশাখী এসে কেবিনে ঢোকে। ঢুকেই সেলিমের দিকে তাকিয়ে বলে, 'না ভাইয়া, হয়নি। ঢাকাইয়া ছবির হিরোরা গুলি খায় না। তারা অক্ষয়, তারা অমর। বেশ ক'জন অস্ত্রধারী গুণ্ডার সঙ্গে ঢাকা বায়স্কোপের চিকন-চাকন ললিপপ মার্কা হিরোও খালি হাতে লড়ে এবং জেতে। জেতে মানে, সর্বদা জেতে। গল্পের মারপ্যাঁচে ওরাও হয়তো কখনও ভুলচুক করে মার খায়। কিন্তু তাই বলে এরা কিন্তু মরে না। এরা হচ্ছে যাকে বলে মৃত্যুহীন প্রাণ। কিন্তু তুমি ? হায়রে আমার কপাল, তুমিতো ভাইয়া আর একটু হলেই গুলি-টুলি খেয়ে আমার মরহুম ভাই হয়ে যেতে।'

কেবিনে ঢুকেই এক নাগাড়ে কথা বলে বৈশাখী থামে।

বৈশাখীকে থামতে দেখেই সেলিম কিছু বলার আগেই শ্রেয়া বলে, 'তুমি কখন এলে বৈশাখী ?'

শ্রেয়ার প্রশ্নের উত্তরে বৈশাখী হেসে বলে, 'আধ ঘণ্টা আগে এসেছি।'

বৈশাখীর কথা শুনে, শ্রেয়া যার-পর-নাই অবাক হয়। অবাক হয়ে বলে, 'আধ ঘণ্টা আগে এসেছ ! তো এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি !'

বৈশাখী মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

বৈশাখীর কথা শুনে, শ্রেয়া অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে মানে ! বারে, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন তুমি !'

ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বৈশাখী এবার বলে, 'ইচ্ছে করেই এক ঘণ্টা দেরি করে এসেছি। ভাবলাম, গিট্টু লাগার জন্যে এই এক ঘণ্টা দু'জনের কাছে বেশ মূল্যবান সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। এসে দেখি একজন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে, আর মিনমিন করে কী সব বলছে। ভাবলাম বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি, শেষমেষ তবু যদি গিট্টুটা লাগে। কিন্তু হায়রে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতে অন্ধ ! একজন কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে প্যানপ্যান করে বলে যাচ্ছে, অন্যজন কিছুই বলছে না।'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া এবার বুঝতে পারে, সে ইচ্ছে করেই দেরি করে এসেছে এবং বাইরে দাঁড়িয়ে সেলিমের কথা-বার্তার সামান্য হলেও কিছুটা শুনেছে। ব্যস, চোখ-মুখ সব লাল হয়ে যায় শ্রেয়ার। একরাশ লজ্জা এসে ভিড় করে চোখ-মুখসহ সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে।

শ্রেয়ার লজ্জায় লাল হওয়া মুখ দেখে, সেলিম দ্রুত বলে, 'এই, তুই এসব কী বলছিস রে বৈশাখী ? খুব ফাজিল মেয়ে হয়েছিস, না ? মুখে যা আসে তাই বলে ফেলছিস !'

মুখরা মেয়ে বৈশাখী কিন্তু সেলিমের এ চোখ রাঙিয়ে কথা বলা শুনেও, থেমে থাকে না। সে মুচকি হেসে বলে, 'একে কি বলে, জানো শ্রেয়া আপু ?'

বৈশাখী বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু না কিছু কথা শুনতে পেরেছে ভেবে শ্রেয়া এতটাই লজ্জা পায় যে, কিছু বলা তো দূরের কথা মাথা তুলে আর তাকাতেও পারে না।

শ্রেয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে, বৈশাখী যে থেমে থাকে তা নয়। সে বলে, 'একে বলে, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর। ইচ্ছে করে দেরি করে আসলাম। আহারে, প্রায় আধ ঘণ্টার মতো বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দু'পা ব্যথা করে ফেললাম। তারপরও আমাকেই কি না চোখ রাঙিয়ে ধমকাধমকি করা ? বুঝেছি—'

'বুঝেছি' পর্যন্ত বলেই থেমে যেতে দেখে সেলিম দ্রুত বলে, 'কী হল ? থেমে গেলি যে ? কী বুঝছিস, বল ?'

সেলিমের কথা শুনে বৈশাখী বলে, 'বুঝেছি, এই দুনিয়ায় আমার মতো ভাল মানুষের কোনও স্থান নেই।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'তুই খুব ভাল মেয়ে, তাই না ?'

বৈশাখী দমে না। দমে যাওয়া মতো মেয়েও সে নয়। ঠোঁটে রহস্যময় এক হাসি ঝুলিয়ে সে বলে, 'না ভাইয়া, না। আমি ভাল নই। একদম ভাল নই। তা তোমার চোখে তামাম দুনিয়ায় ভাল মানুষ তো এখন শুধু একজন। তার নাম কি আমি বলব, ভাইয়া ?'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'সত্যি তুই খুব বাঁদর হয়েছিস। এত বেশি বাঁদরামি শুরু করেছিস কেন তুই, বল তো ?'

সেলিমের কথা শোনে কী না শোনে কে জানে ! চোখে-মুখে এক চিলতে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বৈশাখী আবার বলে, 'আমি আবার পেটের মধ্যে কোনও কথা বেশিক্ষণ রাখতে পারি না, তা তো তুমি জানো ভাইয়া। যদিও তুমি জানো, তবু নামটা না বলা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই। হ্যাঁ, তোমার দু'চোখে

এখন এই ধুলার ধরনীতে ভাল মানুষ শুধু একজনই আছে। সে আর কেউ নয়, আমার দু' চক্ষের বিষ, শ্রেয়া আপু।'

'দু'চক্ষের বিষ' শুনে এতক্ষণ চুপচাপ মাথা নিচু করে থাকা, শ্রেয়াও একপলক বোধহয় মাথা তুলে বৈশাখীকে দেখে। বৈশাখী হঠাৎ কেন এভাবে দু'চক্ষের বিষ বলল, বোধহয় বুঝতে পারে না।

শ্রেয়া কিছু না বললেও, সেলিম দ্রুত বলে, 'সবই না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোর সঙ্গে তো গলায়-গলায় খাতির। তবু দু'চক্ষের বিষ বললি যে ? সত্যি বৈশাখী, তুই মাথামুণ্ডু কখন যে কী বলিস, বুঝতেও পারি না।'

সেলিমের কথা শুনে বৈশাখী হেসে বলে, 'বারে, দশটা না, পাঁচটা না, একটা মাত্র ভাই আমার। সেই সবেধন নীলমণি একমাত্র ভাইকে ছিনতাই করে ফেলল। দু'চক্ষের বিষ বলব না তো, কী বলব বলো ?'

বৈশাখীর কথা শেষ হলে, সেলিম আর কিছু বলতে পারে না। তার আগেই আফজাল হোসেন মরিয়ম বেগমকে নিয়ে কেবিনে এসে ঢোকেন।

মায়ের হৃদয় বলে কথা। মরিয়ম বেগম কেবিনে ঢুকেই, হন্তদন্ত হয়ে সেলিমের বিছানার কাছে এগিয়ে যান। শিয়রে দাঁড়িয়ে অতি দ্রুত ছেলের মাথায়-চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'ভাল আছিস তো বাবা ?'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ। ভাল আছি মা।'

সেলিমের কথা শুনে মরিয়ম বেগম হাসিমুখে বলেন, 'ভাল থাকলেই ভাল বাবা।'

শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বসেন। মাথায়-চুলে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে, মরিয়ম বেগম এতক্ষণ পর বোধহয় শ্রেয়াকে দেখেন। শ্রেয়াকে দেখেই বলেন, 'তুমি কখন এসেছ মা ?'

মরিয়ম বেগমের কথার উত্তরে শ্রেয়া বলে, 'আমি ভার্সিটি থেকে সোজা এসেছি। ঘণ্টাখানেক হল এসেছি।'

কী ভেবে মরিয়ম বেগম বলেন, 'তুমি কি বলো মা, আর ভয়ের কিছু নেই, তাই না ?'

মরিয়ম বেগমের কথার জবাবে শ্রেয়া কিছু বলার আগেই, সেলিম হেসে বলে, 'তুমি আর বাবা এ ক'দিন আমার জন্যে খুব ভেবেছ, তাই না মা ?'

সেলিমের কথা শুনে, ফর্সা মুখ হঠাৎ খানিকটা কালো হয়ে যায় মরিয়ম বেগমের। আনমনা কী যেন ভাবেন ! ভেবে বলেন, 'এক মাকেই কি না তুই জিজ্ঞেস করেছিস, সে তার সন্তানের জন্যে ভেবেছে কি না ! তুই জানিস না

বাবা, জায়নামাজে বসে দু'জনে নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে কত কেঁদেছি। মাজারে কত শিন্নী মানত করেছি। তুই ছাড়া এই পৃথিবীতে আমাদের আর কে আছে, বল ? স্বপ্ন বলিস, ভালবাসা বলিস, সবই তো তুই। তোকে ঘিরেই তো আমাদের যত সব স্বপ্ন দেখা বাবা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল বৈশাখী। কিন্তু আর পারে না। এবার বলে, 'কেন মা ? আমি আছি না ? আরে, তোমাদের অভিধান থেকে আমি কি একেবারে বাদ পড়ে গেছি নাকি, বলো তো মা ?'

বৈশাখীর কথা শুনে, মরিয়ম বেগম হঠাৎ বোধহয় একটু রেগেই যান। তিনি বলেন, 'তুই থাম তো। সব কথার মধ্যে তুই এভাবে নাক গলাস কেন, বলতে পারিস ?'

কথা বলে বৈশাখীর দিকে রেগেমেগে তাকান। বৈশাখী মা'র এই চাহনি চেনে। তাই চুপ করে যায়। আর কথা বাড়ায় না।

বৈশাখীকে থামিয়ে দিলেও, নিজে কিন্তু থেমে থাকেন না। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, মরিয়ম বেগম বলেন, 'একদিন নিশ্চয়ই বিয়ে করবি। বিয়ে করে একদিন নিশ্চয়ই সন্তানের বাবাও হবি। তখন বুঝবি সন্তান কী, বাবা-মা'র অন্তর সন্তানের জন্যে রাত-দিন কেন এভাবে কাঁদে।'

সেলিম জানে, তাকে নিয়ে বাবা-মা'র স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। মেধাবী ছেলে এম, এ, পাশ করলেই ভাল চাকরি পাবে। চাকরি পেলেই ছেলের জন্যে ঘরে মনের মতো বউ আনবেন। সেই মনের মতো বউ মরিয়ম বেগম বেশ ক'বছর থেকে হন্যে হয়ে খুঁজেও বেড়াচ্ছেন। কিন্তু, না। মনের মতো মেয়ে বলতে সেরকম একটা মেয়ে ছেলের জন্যে তিনি কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

মা'র কথার উত্তরে কিছু বলবে বলে বোধহয় মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ডাক্তার নার্সসহ কেবিনে এসে ঢোকেন।

কেবিনে ঢুকেই ডাক্তার সোজা সেলিমের বেডের কাছে এগিয়ে যান। দ্রুত প্রেসার, পাল্‌স, ইত্যাদি পরীক্ষা করে, আফজাল হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনার ছেলে ?'

আফজাল হোসেন বলেন, 'জি।'

গম্ভীরমুখো ডাক্তার এবার আফজাল হোসেন নয়, মরিয়ম বেগমের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনার ছেলে ভাল হয়ে গেছে, বুঝছেন ?'

মায়ের মন বলে কথা। মরিয়ম বেগমের মন অপার খুশিতে ভরে যায়। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌ মেহেরবান। আল্লাহ্‌কে হাজার শোকর গুজর করছি। তিনি আমাদের ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

মরিয়ম বেগমের কথা শুনে, গম্ভীরমুখো ডাক্তারের মুখেও বোধহয় খানিক হাসির ঝিলিক দেখা যায়। তিনি বলেন, 'শুধু আল্লাহ্‌কে শোকর গুজর করবেন ? আমাদের কিছুই বলবেন না ?'

মরিয়ম বেগম ডাক্তারের কথা শেষ হতেই দ্রুত বলেন, 'কী যে বলেন ডাক্তার, আপনাদের কৃতজ্ঞতা না জানালে কি হয় ? আপনাদেরও ধন্যবাদ। আপনারা সত্যি অনেক করেছেন আমার ছেলের জন্যে।'

কী ভেবে ডাক্তার বলেন, 'গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আপনার ছেলেকে নিয়ে, প্রায় সব পত্রিকা জুড়ে বেশ ক'দিন ধরে অনেক নিউজ হয়েছে। পত্রিকার নিউজ পড়েই জেনেছি, আপনার ছেলে শুধু মেধাবী না, খুবই মেধাবী। মেধাবী ছেলের এসবের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার মানে, শুধু আপনাদের পরিবারের নয়, দেশেরও ক্ষতি। তবে আপনার ছেলের জন্যেই একটা মেয়ের সম্মান রক্ষা পেয়েছে, এটাও ঠিক।'

ডাক্তারের কথার পিঠে মরিয়ম বেগম এবার বলেন, 'আমার ছেলে এমনিতে কিন্তু খুব ভীতু। কিন্তু সেদিন যে কী হল, হঠাৎ গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লাগতে এগিয়ে গেল।'

আফজাল হোসেন এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনি বলেন, 'ছেলেকে আমরা কবে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব, ডাক্তার সাহেব ?'

ডাক্তার আফজাল হোসেনের কথার প্রতিউত্তরে বলেন, 'কাল বিকেলে এসে বাড়ি নিয়ে যাবেন, কেমন ? তা এই যে সেলিম সাহেব, অনেক দিন পর বাড়ি যাবেন। কেমন লাগছে আপনার, বলুন তো ?'

ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে কিছু না কিছু বলতে হয়। তাই দ্রুত বলে সেলিম, 'ভাল।'

ডাক্তার নার্সসহ চলে যান।

ডাক্তারের বলা শেষ প্রশ্নটা নিয়ে, অবচেতনে নিজের মনের মধ্যে নিজেই নাড়াচাড়া করে। যদিও উত্তরে ভাল বলেছে, সত্যি কি ভাল লাগছে তার ? এতদিন পর বাড়ি ফিরবে, কিন্তু কই, ভাল লাগছে না কেন ? বরং বলা যায়, উল্টো মনটা যেন বিষাদে ছেয়ে গেল !

কেন এমন হল! কেন এভাবে ভাল লাগার পরিবর্তে উল্টো খারাপ লাগছে, নিজেও বুঝতে পারে না। তাহলে কি প্রতিদিন শ্রেয়ার সঙ্গে আর দেখা হবে না, সে জন্যেই এত খারাপ লাগছে ! হ্যাঁ তাইতো, মা-বাবা, বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছে, আনন্দ নয়, কষ্ট হচ্ছে কেন তার !

হ্যাঁ। এর কারণ যে শ্রেয়া, এটা বুঝতে পারে। কিন্তু কেন এমন লাগছে !

শ্রেয়া তার কে যে, এত কষ্ট হচ্ছে তার ! সত্যি তো, যতই স্বপ্ন দেখুক, এটা-ওটা যতই ভাবুক, শ্রেয়া তো তার কেউ নয়।

সেলিমের এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই মরিয়ম বেগম বলেন, 'আমরা এখন যাই বাবা। কাল বিকেলে এসে তোকে বাড়ি নিয়ে যাব, কেমন ?'

বিষণ্নতায় ছেয়ে আছে মন-প্রাণ। তাই মা'র এ কথার জবাবে মুখ খুলে আর কিছু বলে না। কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সেলিম।

ছেলের মাথায়-চুলে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিয়ে, উঠে দাঁড়ান মরিয়ম বেগম। দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'চলো, যাই।

মা'র কথা শেষ হতেই, বৈশাখী শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে বলে, 'আমিও মা- বাবার সঙ্গে যাই। কি বলো, শ্রেয়া আপু ?'

বৈশাখীর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বুঝতে পারে না, তা নয়। তাই আমতা-আমতা করে বলে, 'ইয়ে মানে—'

বৈশাখীর কথার উত্তরে কী যেন বলতে চায় শ্রেয়া, কিন্তু পারে না। শ্রেয়ার অবস্থা দেখে, বৈশাখী হেসে আবার বলে, 'ভাইয়ার একদম খারাপ লাগবে না। তুমি তো আছ। আমি না হয় এখন যাই। চলো, মা।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না। মরিয়ম বেগম ও আফজাল হোসেনের সঙ্গে চলে যায় বৈশাখী। শ্রেয়া বুঝতে পারে, ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে তাকে এবং সেলিমকে সুযোগ করে দিয়ে গেল বৈশাখী।

কিন্তু, না। বৈশাখী জানে না, যতই সুযোগ সৃষ্টি করে দিক, শ্রেয়া কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে চায় না।

দেখে সেলিম পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলবে বুঝতেও পারে না। হাতের কাছে বলার মতো কোনও কথা না পেয়ে শ্রেয়া বলে, 'মাসখানেক পরই তো আপনার পরীক্ষা, তাই না ?'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ। তার মানে আপনি জানেন, আমি ইংরেজি ফাইনাল ইয়ার ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বারে, জানব না কেন ? আপনি ভার্সিটির কত মেয়ের স্বপ্নের রাজপুত্তুর, আপনি তো তা জানেন না।'

শ্রেয়ার কথা শুনে হাসে। হেসে বলে, 'কই, না তো। জানি না তো। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, আমি কিন্তু অনেক মেয়ের স্বপ্নের রাজকুমার হতে চাই না।'

সেলিমের কথা শ্রেয়া বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।'

সেলিম হেসে বলে, 'বুঝিয়ে বলব ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বলুন ?'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'আমি শুধু একজনের স্বপ্নের রাজকুমার হতে চাই। আর কারও নয়। সেই একজনের নামও কি বলতে হবে আমাকে ?'

ব্যস, চোখ মুখ সব গোধুলির রাঙা সূর্যের মতো লাল হয়ে যায়। না, আর কিছুই বলতে পারে না।

তাই বলে সেলিম কিন্তু থেমে থাকে না। সে বলে, 'কি, নামটা বলব আমি ?'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে হলেও কিছু না কিছু বলতে হয়। শ্রেয়া তাই দ্রুত বলে, 'পরীক্ষার ঠিক আগে আমার জন্যে, ক্লিনিকে এই ভাবে বেশ ক'দিন পড়ে থাকলেন। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছেন। এবার যদি একই রেজাল্ট না হয়, তা হলে ? আমি কিন্তু ভাববো আমারই জন্যে এরকম হল।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হেসে বলে, 'কেন ? আপনি নিজেকে দোষী ভাবছেন কেন ?'

সেলিমের প্রশ্ন শুনে শ্রেয়া খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে যে মেধাবী ছেলে, সে হঠাৎ পরীক্ষায় খারাপ করার কারণ থাকবে না, তা তো নয়। আমার সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়েই তো আপনার এ হাল হয়েছে। বেঁচে যে আছেন, সেটাই তো ভাগ্য।'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'এ ক'টা দিন পড়াশোনা করে দেখি, সব সময় যা হই তা হতে পারি কি না। যদি এবারও ফার্স্ট হই, তাহলে তো আপনার আর নিজেকে অপরাধী ভাবতে হবে না। ঠিক কি না, বলেন ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আপনাকে ফার্স্ট হতেই হবে।'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'যদি সেকেন্ড হই ?'

শ্রেয়া বলে, 'কষ্ট পাব। ভীষণ কষ্ট পাব আমি। কী আর করব, নিজেকে চিরকাল অপরাধী ভাবব।'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'ফার্স্ট হলে খুশি হবেন তো আপনি ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'খুশি মানে, খুব খুশি হব।'

সেলিম এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আপনাকে খুশি করার জন্যে চেষ্টা করব আমি। কথা দিলাম। কিন্তু আমার খুশির কী হবে ? আমাকে খুশি করার চেষ্টা করবেন না আপনি, বলেন ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'আপনি কী বলছেন

আমি বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়ার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে খানিক অপলক শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, কী যেন ভাবে সেলিম ! তারপর বলে, 'আমার খুশি সব যে আপনার কাছে শ্রেয়া। তা কি আপনি জানেন না ?'

সেলিমের কথা শুনে, অবাক হয়ে বলে, 'আমার কাছে ! কি বলছেন আপনি !'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, সেলিম বলে, 'হ্যাঁ শ্রেয়া, হ্যাঁ। আমার আনন্দ, আমার খুশি সব এখন আপনার কাছে।'

বড় সাধ হয় বলে, 'হ্যাঁ, সেলিম। তোমার খুশি, তোমার আনন্দ সবইতো আমি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি আজ কথা দিলাম, তোমার জীবন আমি আনন্দে-খুশিতে পুরোপুরি ভরিয়ে দেব।'

কিন্তু, না। কিছুই বলতে পারে না শ্রেয়া।

বড় সাধ হয়, সেলিমকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, ভালবাসে। ভালবেসে সেলিমের ভালবাসার আহ্বানে সাড়া দেয়।

কিন্তু আকাশ ছোঁয়া এ স্বপ্ন দেখলেই তো আর হবে না। সে জানে, সেলিমকে ভালবাসার সাধ থাকলেও, সাধ্য তার নেই।

দেখে সেলিম মুগ্ধ দুটো চোখে তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলবে না বলবে বুঝতে পারে না। তাই বলে, 'সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি এখন যাই।'

যাই বলে আর অপেক্ষা করে না। দ্রুত মুগ্ধ ঐ দুটো চোখের নাগাল থেকে পালিয়ে বাঁচে শ্রেয়া।

সেলিম বাড়ি ফেরে।

বাড়িতে ফিরেও ঐ একটা চিন্তাই পেয়ে বসে তাকে।

শ্রেয়া ! শ্রেয়া ! শ্রেয়া !

শ্রেয়া ছাড়া যেন কিছু নেই ! জীবনটা পুরোপুরি যেন শ্রেয়াময় হয়ে গেছে তার !

কিন্তু সারা দিন-রাত এই একটা ভাবনা ভেবে সময় পার করে দিলে তো আর হবে না। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। সব সময় ফার্স্ট হওয়ার যে রেকর্ড, তা জীবনের শেষ পরীক্ষায় এসে ভেঙে যাক, এটা নিজেও চায় না। তাছাড়া শ্রেয়াকেও কথা দিয়েছে, যে করেই হোক ফার্স্ট হবে।

শ্রেয়ার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, পড়াশোনায় মনযোগ দেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু, পারে না। শ্রেয়াকে ভাববে না ভেবেও, শ্রেয়াকেই ভাবে। পড়ার টেবিলে বারে-বারে একটি সুন্দর মুখই কেবল চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অবশেষে অনেক কসরত করেও যখন পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না, তখন শ্রেয়ার সঙ্গে দেখা করবে বলেই মনে-মনে ঠিকঠাক করে। বুঝতে পারে, শ্রেয়াকে সে শুধু ভালবাসেনি, দারুণ ভালবেসে ফেলেছে। জীবনটা হঠাৎ এমনই এক বাঁকে এসে থমকে দাঁড়ায় যে, শ্রেয়াহীন জীবনকে জীবনই মনে হয় না সেলিমের।

বুঝতে পারে, শ্রেয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া না হলে আর পড়াশোনায় মন বসবে না। পরদিন ভার্সিটিতে শ্রেয়াকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু পায় না। এর পরদিনও বহু খোঁজাখুঁজি করে। তাও পায় না। কী আশ্চর্য, তারপর দিনও খোঁজে, কিন্তু পায় না সে শ্রেয়াকে।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও, পরে বুঝতে পারে, শ্রেয়া তাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছে।

এড়িয়ে যাবে কোথায় শ্রেয়া ? দু'-একদিন যেতে না যেতেই টি.এ.সির

সামনে ঠিকই দেখা হয়ে যায়।

দু'জন দু'দিকে থেকে হেঁটে আসছিল। মুখোমুখি হতেই সেলিম বলে, 'কেমন আছেন শ্রেয়া ? আমি আপনাকে গত ক'দিন থেকে কত খুঁজেছি, জানেন ?'

সেলিমের সঙ্গে দেখা হবে বোধহয় ভাবতেও পারেনি। তাই চমকে ওঠে সে।

সেলিম আবার বলে, 'কী হল, আমার কথা শুনতে পাননি আপনি ?'

কিছু না কিছু বলতেই হয়। তাই শ্রেয়া বলে, 'আপনি আমাকে হঠাৎ কেন খুঁজেছেন, বলুন ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হতবাক হয়ে বলে, 'হঠাৎ বলছেন কেন ! আপনাকে আমি কি খুঁজতে পারি না, শ্রেয়া ! এ কথা কী বলছেন আপনি !'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই শ্রেয়া আবার বলে, 'তা কেন খুঁজছেন, বলুন ?'

শ্রেয়াকে এভাবে কথা বলতে দেখে সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'আপনার কী হয়েছে, শ্রেয়া ! এভাবে কথা বলছেন কেন ! আপনার কথা-বার্তা, চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার সাথে যেন আপনার দেখা না হলেই ভাল হত !'

শ্রেয়ার চোখে-মুখে কোথাও হাসির সামান্য লেশমাত্রও নেই। সেলিমের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই, সেই যে গম্ভীর হয়ে আছে-তো-আছেই।

শ্রেয়া একইরকম বলে, 'আপনি কী বলবেন বলে আমাকে খুঁজছেন, সেটা বলুন, প্লিজ।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম দ্রুত বলে, 'কোথাও বসলে হয় না ?'

মাথা নিচু করে শ্রেয়া বলে, 'আমার ক্লাশ শেষ। আমি এখন বাড়ি যাব।'

সেলিম অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল, আর বোধহয় পারে না। সামান্য হলেও রেগে বলে, 'ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, শ্রেয়া।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই অস্ফুট বলে, 'কোথায় যাব আমরা ?'

সেলিম খানিক ভাবে। তারপর বলে, 'কোথাও নিরিবিলিতে বসতে চাই। আপত্তি আছে আপনার ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কোথায় ?'

শ্রেয়ার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ারও যেন কোনও প্রয়োজন মনে করে না। ইশারায় একটা বেবিট্যাক্সি ডেকে প্রথমে নিজে উঠে বসে। তারপর বলে, 'আসুন। উঠে আসুন।'

কী আর করে, ইচ্ছে না থাকলেও উঠে সেলিমের পাশে গিয়ে বসতে হয়। বেবিট্যাক্সিতে বসেই, ড্রাইভারকে সেলিম বলে, 'কাকরাইল চলো, ড্রাইভার।'

না। বেবিট্যাক্সিতে দু'জনের কেউ আর কিছু বলে না।

দু'জনে কাকরাইলে পৌঁছে একটা চাইনিজে এসে ঢোকে।

একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি বসতেই, সেলিম বলে, 'কী খাবেন, বলেন ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কিছু না।'

শ্রেয়ার 'কিছু না' শুনে সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'আপনার কী হয়েছে শ্রেয়া ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে কেন যেন কিছু বলে না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে শ্রেয়া।

সেলিম বয়কে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে, রেস্টুরেন্টের আলো-আঁধারির মধ্যে, পুতুলের মতো নিশ্চুপ বসে থাকা শ্রেয়ার দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'আমি আপনাকে কেন খুঁজছি, কেন এখানে ডেকে এনেছি, আপনি কি সত্যি বুঝতে পারছেন না ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'আমি জানি।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, সেলিম দ্রুত বলে, 'সত্যি বলছেন শ্রেয়া! আপনি জানেন !'

শ্রেয়া বলে, 'মিথ্যে বলব কেন ? আমি জানি, আপনি আমাকে কেন খুঁজছেন। কী বলতে চান। আপনি আমাকে ভালবাসেন। আমাকে ছাড়া বাঁচবেন না। এসব কথাই বলবেন তো ?'

সেলিম মরিয়া হয়ে বলে, 'হ্যাঁ শ্রেয়া, হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। বিশ্বাস করো তুমি।'

সেলিমের মুখে হঠাৎ 'তুমি' শুনে, শ্রেয়া বলে, 'ভুল করে আপনি বোধহয় আমাকে 'তুমি' বলে ফেলেছেন।'

সেলিমের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! বলে, 'বলব। একশ' বার বলব। আমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে তুমিই বলব।'

সেলিমের বেপরোয়া কথা-বার্তা শুনে, শ্রেয়া অবাক হয় না, তা নয়। অবাক হয়ে বলে, 'আমাকে কেন আপনি তুমি বলবেন ! আমাকে আপনার তুমি বলা কি ঠিক, বলেন ?'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃদু টেবিল চাপড়ে সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার স্বপ্ন, আমার ভালবাসা, আমার বেঁচে থাকা,

মরে যাওয়া, সব। হ্যাঁ, এ আমার অধিকার। এ আমার ভালবাসার অধিকার। তোমাকে আমি শুধু একবার না, হাজারবার তুমি বলব শ্রেয়া।'

সেলিমের কথার উত্তরে আর কিছু বলার আগেই, বয় গরম স্যুপের বাটি নিয়ে এসে, টেবিলে দু'জনের সামনে রাখে।

সেলিম প্রথমে শ্রেয়ার স্যুপের বাটিতে স্যুপ দেয়। তারপর নিজের বাটিতে খানিকটা নিয়ে বলে, 'খাও, শ্রেয়া।'

কী ভেবে শ্রেয়া আর কিছু বলে না। মাথা নিচু করে খায়।

সেলিমের যেন তর সয় না। সে আবার বলে, 'কিছু বলছ না যে ?'

শ্রেয়া বলে, 'কী বলব ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কী বলব মানে ? তুমি শোনোনি, আমি কি বলেছি ? তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কি শুনতে চাই ?'

মাথা নিচু করে শ্রেয়া বলে, 'আপনাকে ভালবাসতে হবে, এই তো ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ।'

মাথা নিচু করে, এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে শ্রেয়া ! তারপর বলে, 'আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন, জানি। তবু বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসতে পারব না। কিছুতেই না।'

চৈনিক রেস্তোরাঁর আলো-আঁধারিতে ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। মনে হয় উদ্‌ভ্রান্তের মতো কী যেন ভাবে ! তারপর অসহায়ের মতো বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি শ্রেয়া। বড় ভালবাসি।'

সেলিমের এ কথার জবাবে, শ্রেয়া কেন যেন আর কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে।

বয় এসে দু'জনের সামনে থেকে স্যুপের বাটি সরিয়ে নিয়ে, অন্যান্য খাবার-দাবার সাজিয়ে দিয়ে যায়।

সেলিম আবার বলে, 'খাও, শ্রেয়া।'

শ্রেয়া খায়। খেতে-খেতে সেলিম আবার বলে, 'কিছু বলো, শ্রেয়া ? তোমার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। এটা বুঝতে পারছ না তুমি ?'

মাথা নিচু করে খেতে-খেতে শ্রেয়া বলে, 'আমার আর কিছু বলার নেই।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো খানিক তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'তুমি কি চাও, আমি শেষ হয়ে যাই ? আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'না, চাই না। এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো ছিমছাম জীবন আপনার। এমন জীবন ক'জনের হয় ? মা, বাবা, আদরের ছোট বোন। এমন সুন্দর একটা জীবন নষ্ট করবেন কেন, বলেন ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে খানিক ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'বিশ্বাস করো শ্রেয়া, তোমাকে না পেলে পৃথিবীর কোনও সুন্দরই আমার কাছে আর সুন্দর থাকবে না। হ্যাঁ, বিশ্বাস করো তুমি, তোমাকে ছাড়া এ জীবন আমার কাছে আর কোনও জীবনই নয়। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তুমি ছাড়া জীবনের বাকি সবকিছুই আমার কাছে শূন্য, একেবারে ফাঁকা।'

একটানা কথা বলে থামে।

সেলিম থামে ঠিকই। কিন্তু শ্রেয়া কেন যেন কিছু বলে না। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে খায়।

শ্রেয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম আবার বলে, 'হ্যাঁ শ্রেয়া, হ্যাঁ। তোমাকে পেলেই আমার যত আনন্দ, যত সুখ। এখনও কি এটা বুঝতে পারছ না, তুমি ?'

কেন যেন শ্রেয়া এবারও কিছু বলে না। কেবল নিঃশব্দে খায়।

সেলিম আবার বলে, 'হ্যাঁ, শ্রেয়া। বিশ্বাস করো তুমি, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমি ধ্বংস হয়ে যাই, আমি শেষ হয়ে যাই, তুমি কি তাই চাও, বলো তুমি ?'

চমকে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'না, তা চাই না। আপনার কোনও অমঙ্গল হোক অকল্যাণ হোক, তা আমি চাই না।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, সেলিম দ্রুত বলে, 'আমি ধ্বংস হয়ে যাই, এ তুমি চাও না। আবার আমি আমার ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকি, এও তুমি চাও না। বলো, এ তুমি কেমন শ্রেয়া ?'

আবছা আলো-অন্ধকারে আবার মাথা তুলে তাকায় শ্রেয়া। তাকিয়ে বলে, 'পুরো একটা পরিবার আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। মা-বাবা, ছোট বোন বৈশাখী, সবার স্বপ্ন আপনি। আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ের জন্যে দিওয়ানা হয়ে গেলেন আপনি ! ছি ! এত মেধাবী আপনি। এই দেশও তো আপনার কাছে কিছু না কিছু চায়। আমার মতো একটা অতি সাধারণ মেয়ের জন্যে, নিজেকে নষ্ট করে দেয়ার কথা ভাবাও আপনার পাপ, বুঝেছেন ?'

কী হয় কে জানে ! যে সেলিম জীবনে কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে চোখে-চোখ রেখে কথা বলা তো দূরের কথা, মেয়েদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি,

সে বলে, 'না, আমি পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, কোনও কিছুই বুঝি না। আমি শুধু তোমাকে বুঝি। তোমাকে চাই। পৃথিবীর যে কোনও কিছুর বিনিময়ে, আমি তোমাকে চাই। হ্যাঁ, শুধু তোমাকেই চাই, শ্রেয়া।'

কী ভেবে শ্রেয়া হঠাৎ বলে, 'আমাকে না পেলে কী করবেন আপনি ? এই যে নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন বলছেন, তার মানে কী বলুন তো ? আপনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন না তো ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আমি সত্যি জানি না। নিজের ওপরও এখন আর আমার বোধহয় কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার আজকের রাত, আগামী কালের সকাল সম্পর্কে আমি নিজেও আর কিছুই জানি না। আমার এ কথার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। বিশ্বাস করুন।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, হতবাক হয়ে বলে, 'কী বলছেন আপনি ! আপনার নিজের ওপর নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই ! তো কার নিয়ন্ত্রণ আছে, বলেন !'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আপনার।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'আসলে আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন না, পাগলের মতো কী যা তা সব বলছেন আপনি !'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, পাগল। আমি আর সুস্থ আছি কই ! আপনাকে পাগলের মতো ভালবেসে, আমি পাগলই তো !'

বড় সাধ হয়, সেলিমের এই ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসার কথা বলে। কিন্তু, না। এ সম্ভব নয়। কোথায় সেলিম, আর কোথায় সে !

কী ভেবে শ্রেয়া এবার বলে, 'আত্মহত্যা পাপ, এটা জানেন তো ? সাহসী মানুষেরা কিন্তু আত্মহননের কথা কখনও ভাবে না। একজন সাহসী মানুষ জীবনে যা কিছু সবই মোকাবেলা করে। আত্মহননের মানে তো পৃথিবী থেকে, জীবন থেকে চিরতরে পালিয়ে যাওয়া। শোনেন, জীবনের সবটা যেমন দুঃখের নয়, আবার পুরোটা সুখের হবে, তাও নয়। সুখ আর দুঃখ এ দুটো নিয়েই তো মানুষের জীবন। সেই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার জীবন থেকে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবে আপনার মতো মেধাবী এক যুবক ! ছি ! আমি ভাবতেও কষ্ট পাচ্ছি।'

শ্রেয়া একটানা কথা বলে থামতেই সেলিম বলে, 'শেষ হয়েছে তো আপনার লেকচার ?'

সেলিমের অধৈর্য হওয়া দেখে, শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'জি, না। লেকচার তো, শুধু এ দেশে রাজনীতিবিদরা দেবেন। সুযোগ বুঝে আপনাকে সামান্য জ্ঞান দিলাম।'

শ্রেয়াকে হাসতে দেখে, সেলিম অসহায়ের মতো বলে, 'তুমি হাসছ শ্রেয়া! আমার জীবনের সবচে' বড় সত্যি, আমার ভালবাসা নিয়ে তুমি মস্করা করছ ! ছি শ্রেয়া ! ছি !'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেলিমের এই বেপরোয়া ভালবাসার সামনে, নিজেও দুর্বল হয়ে যায়নি, তা নয়। ইচ্ছে করে এই আলো-অন্ধকারে একটা হাত ধরে সেলিমের। ধরে বলে, 'হ্যাঁ, সেলিম হ্যাঁ। আমিও তোমাকে ভালবাসব। এত ভালবাসব যে, তুমি দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখবে তুমি, পৃথিবীতে কেউ কাউকে এর আগে আর এত ভালবাসেনি কখনও।'

বড় ইচ্ছে করে ,সেলিমকে ভালবাসে। বড় সাধ হয় তার, সেলিমকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যা হবার নয়, যা কখনও হবে না, সেই স্বপ্ন দেখে কী লাভ! সেলিমের মতো এত মেধাবী একজন তার পাশে এসে দাঁড়াবে, তার জীবন সাথী হবে, এটা ভাবাও অন্যায়। না, এই অলীক স্বপ্ন সে আর দেখতে চায় না। নিজের স্বপ্নদেখা মনকে তাই নিজেই প্রবোধ দেয়, বোঝায়।

শ্রেয়াকে চুপচাপ থাকতে দেখে সেলিম বলে, 'কিছু বলো, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া বলে, 'কী বলব ?'

টেবিলে মৃদু চাপড় মেরে উত্তেজিত সেলিম বলে, 'আমি বলে দেব, তুমি কী বলবে ? তুমি জানো না শ্রেয়া, আমি কি শুনতে চাই ?'

নিচু মাথা আরও নিচু করে শ্রেয়া বলে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার আর কিছুই বলার নেই।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, বোধহয় মুষড়ে পড়ে। সামান্য হলেও বোধহয় কেঁদে ফেলে। তারপর কোনওমতে সেলিম বলে, 'আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাই শ্রেয়া। ভালবাসা ভিক্ষে চাই। আমার জীবন ভিক্ষে চাই।'

সেলিমের চোখের জলের আর্তি বোধহয় ভেতরে গিয়ে বাজে। ভেতরটাও ভিজে ওঠে না, তা নয়। দ্রুত বলে, 'আমি শুধু সাধারণ নয়, অতি সাধারণ একটা মেয়ে। সেই আমার কাছেই কি না ভিক্ষে চাইছেন আপনি! কেন এমন করছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

এবার আর কান্নার শব্দ শোনা য়ায় না। অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'হ্যাঁ, ভিক্ষে চাই। আমি ভিক্ষে চাই তোমার কাছে। ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে কথা না বলে, ভণিতা না করে, সামান্য ভালবাসা তুমি আমাকে ভিক্ষে দেবে কি না, বলো শ্রেয়া ?'

সেলিমের এত ভালবাসা দেখে, বিনিময়ে নিজের ভেতরটাও সেলিমকে একটু ভালবাসা দেবার জন্যে বোধহয় হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু বামন হয়ে আকাশে হাত বাড়ালেই তো হবে না। নিজের স্বপ্ন দেখা মনকে তাই শাসন করে।

শ্রেয়াকে চুপচাপ কী ভাবতে দেখে সেলিম আবার বলে, 'কই, বললে না ? দেবে একটু ভালবাসা ভিক্ষে আমাকে ?'

নিচু মাথা আরও নিচু করে বলে, 'আপনি কী, বলুন তো ? জীবনে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন আপনি। আপনি এত বোঝেন, অথচ এটা বোঝেন না, ভালবাসা হাত পেতে ভিক্ষে নেয়ার জিনিস নয়। আর ভিক্ষে দেয়ার জিনিসও নয়।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে, অসহায়ের মতো বলে, 'তোমার ভালবাসা পেতে হলে, আমাকে কী করতে হবে, বলো তুমি ? হ্যাঁ, তুমি যা বলবে, আমি করব শ্রেয়া। যদি আগুনে হাত দিতে বলো, আগুনেও হাত দেব।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'ছি ! এসব কী বলছেন আপনি ! আপনি না ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ! সেরা ছাত্র। এত পড়াশোনা জেনে কী লাভ হল আপনার, বলেন ! তা কি করবেন, বলব আমি ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই বলে, 'বলো, শ্রেয়া বলো ? আমি এখন কী করব, বলো তুমি ?'

শ্রেয়া বলে, 'সোজা বাসায় যাবেন। মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। সারাজীবন ফার্স্ট হওয়া যে রেকর্ড, তা যে করেই হোক ভাঙা চলবে না, বুঝেছেন ?'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, সেলিম দ্রুত বলে, 'আর কিছু বলবে না, শ্রেয়া ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'এখন শুধু পড়াশোনা করা, আর ফার্স্ট হওয়া। না, এখন আর কোনও কথা নেই আমার।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আর কোনও কথা নেই ? আর কিছুই কি তোমার বলার নেই, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া বলে, 'না। আমার আর কিছুই বলার নেই। শুধু বলব, ভালভাবে পড়াশোনা করতে হবে। সব সময় ফার্স্ট হওয়া ছেলেটাকে, এবারও ফার্স্ট হতে হবে।'

এই আবছা আলো-আঁধারিতেও বুঝতে পারে শ্রেয়া, সেলিম কেঁদে ফেলেছে। রুমালে দু'চোখ মুছে, বয়কে ডেকে বিল পেমেন্ট করে শ্রেয়ার দিকে

আবার তাকায় সেলিম। কান্নাভেজা গলায় কোনওমতে বলে, 'সত্যি, তুমি কী! তুমি মানুষ, না পাথর, বলো শ্রেয়া !'

সেলিমের এ কথার উত্তরে, আর কিছু বলে না। বুঝতে পারে, শুধু সেলিম নয়, নিজেরও দু'চোখ ভিজে উঠেছে।

কেন যেন সেলিম আর কিছু বলে না। উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে শুধু বলে, 'চলো, শ্রেয়া।'

দু'জনে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুপুরের গনগনে রোদের মধ্যে, কাকরাইলের ব্যস্ত রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

শ্রেয়া একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসে।

সেলিম তাকে রিক্সায় উঠতে দেখেই বলে, 'তোমায় অনেক কষ্ট দিলাম, শ্রেয়া।'

শ্রেয়া সেলিমের এ কথার জবাবে কেন যেন কিছু বলে না। সেলিমই আবার বলে, 'আমাদের আর দেখা হবে না, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া সেলিমের এ কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'ফার্স্ট হবেন কি না, তাই বলুন ?'

রিক্সা ছেড়ে দিয়েছে। চলন্ত রিক্সার পাশে দাঁড়িয়ে, বিষণ্ন সেলিম বলে, 'মৃত মানুষের আর ফার্স্ট-সেকেন্ড ! আমি কি বেঁচে আছি যে ফার্স্ট হব !'

সেলিমের কথা শ্রেয়া চলন্ত রিক্সায় বসে, শোনে কি না শোনে, কে জানে! শ্রেয়ার রিক্সা ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেলিম শ্রেয়ার রিক্সা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সারারাত বিছানায় শুয়ে ঐ একজন মানুষকে নিয়েই ভেবেছে। একটুও ঘুমাতে পারেনি। রাতভর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই কাটিয়ে দিয়েছে শ্রেয়া।

একটা চিন্তাই কেবল বারে-বারে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সেলিম আবার হঠাৎ সত্যি কিছু করে বসবে না তো ! যে ভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো করছিল, শেষমেষ কেঁদেও ফেলেছে, যে কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেললে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শ্রেয়া বুঝতে পারে না, এখন কী করবে সে ! ভালবাসবে সেলিমকে ! কিন্তু তা কী করে সম্ভব ! সে জানে, তার তো কোনও অধিকার নেই, এ জীবনে আর কাউকে ভালবাসার !

ভালবাসতে পারে না। আবার সেলিমকে এভাবে ফিরিয়ে দিয়েও হৃদয়টা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বুঝতে পারে, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জীবনটা আজ এক অদ্ভুত বাঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ! এ কেমন ভাগ্য তার, বুঝতে পারে না শ্রেয়া ! অনেক ভালবাসা পেয়েও, একটু ভালবাসা দেয়ার অধিকার নেই। আবার ফিরিয়ে দিয়েও, ব্যথায় ভরে যায় মন-প্রাণ।

কে ঘুমিয়েছে, কে ঘুমায়নি, তার জন্যে রাত কিন্তু বসে থাকে না। রাত তার নিজের নিয়মেই চলে, নিজের নিয়মেই আবার ফুরিয়ে যায়। শ্রেয়া আজ ঘুমাতে পারেনি বলে, রাত শেষ হয় না, তা নয়। আজও রাত তার মতোই ফুরায়। যথারীতি ভোর হয়। অল্প-অল্প করে চারদিকে ভোরের আলো ফোটে। একটা-দুটো পাখি ডাকে।

রাতভর ঘুমাতে পারেনি বলে, সকালে বিছানায় শুয়ে থাকে, তা নয়। এমনিতে রোজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস। আজও একই সময়ে বিছানা ছাড়ে শ্রেয়া।

বিছানা থেকে নেমেই বারান্দায় এসে, আনমনে খোলা আকাশের দিকে তাকায়। দিগন্ত বিস্তৃত স্বচ্ছ নীল আকাশ। যেদিকে দু'চোখ যায়, নীল আর নীল।

নীল রং খুব প্রিয় তার। স্বচ্ছ নীল আকাশ আরও বেশি প্রিয়। কিন্তু আজ আর কেন যেন, এই আদিগন্ত বিস্তৃত স্বচ্ছ নীলাকাশও ভাল লাগে না শ্রেয়ার।

বারান্দায় দাঁড়িয়েও রাতভর যাকে নিয়ে ভেবেছে, সেই একজনকে নিয়েই ভাবে। মন চায় এত ভালবাসার বিনিময়ে কাছে যায়, একটু ভালবাসে। কিন্তু না, এ জীবনে তা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

ভালবেসে গ্রহণ করতে পারে না। আবার এত ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়েও রাতভর ঘুমাতে পারে না। এ কেমন জীবন, এ কেমন ভাগ্য, নিজেও বুঝতে পারে না শ্রেয়া !

বিষণ্ন চিত্তে আকাশের দিকে তকিয়ে, হঠাৎ একটা প্রশ্নই মনের মধ্যে কাঁটার মতো বেঁধে। সেলিম সত্যি ভাল আছে তো ! পাগলের মতো ভালবেসেছে। উন্মাদের মতো কাল কত কী বলেছে, তার ঠিক নেই ! নিজেকে নষ্ট করে দেয়ার, ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে– শুধু একবার নয়, বহুবার।

ভাল আছে তো সেলিম! প্রশ্নটা নিয়ে নিজের মধ্যে নিজেই বেশ খানিকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে।

যদি হুট করে কিছু করে বসে, তাহলে! ভাবতে গিয়েই ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় কেঁপে ওঠে শ্রেয়া ! তাই তো, সেলিম সত্যি আবার উল্টোপাল্টা কিছু করে বসেনি তো ! এখন কেমন আছে, কী করছে, জানার জন্যে মন-প্রাণ সব হঠাৎ করেই এবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার।

বৈশাখী নিজের হাতে তার ডাইরিতে নাম্বার লিখে দিয়েছে। ভাবে, টেলিফোন নাম্বার তো আছে। একটা ফোন করলে কেমন হয় ?

আবার ভাবে, না, এই মুহূর্তে সেলিমকে কিছুতেই টেলিফোন করা চলবে না। সে ফোন করবে বৈশাখীকে। কথার ফাঁকে সেলিম কেমন আছে, কী করছে, নিশ্চয়ই জেনে নিতে পারবে। কিন্তু এত ভোরে টেলিফোন করা ঠিক হবে কি না তাও ভাবে।

তখনই পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা মা আয়েশা খাতুন পেছনে এসে দাঁড়ান। মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে তিনি বলেন, 'তোর টেলিফোন মা।'

মা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরও পায়নি। চমকে মা'র দিকে তাকিয়ে, শ্রেয়া বলে, 'এত সকালে কার টেলিফোন মা !'

আয়েশা খাতুন বলেন, 'নাম জিজ্ঞেস করতে বলল, বৈশাখী।'

চমকে ওঠে শ্রেয়া ! ভয়ানক চমকে ওঠে !

বৈশাখী আবার এত ভোরে টেলিফোন করেছে কেন, বুঝতে পারে না। ভাবে সেলিমের কিছু হয়নি তো ! অজানা এক ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় ভীষণ কেঁপে ওঠে শ্রেয়া !

তাছাড়া বৈশাখী তাকে কখনও টেলিফোন করেনি। এই প্রথম ফোন করল। তাও এত ভোরে। কে জানে, এখন কেমন আছে সেলিম !

মা'র শোবার ঘরে টেলিফোনের কাছে ছুটে যায়। টেলিফোন ধরেই বলে, 'হ্যালো, আমি শ্রেয়া।'

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বৈশাখী বলে, 'আমি বৈশাখী, শ্রেয়া আপু।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'ভাল আছ, বৈশাখী ?'

বৈশাখী কেন যেন শ্রেয়ার এ কথা শুনে, কিছু বলে না।

বৈশাখীকে চুপচাপ দেখে, শ্রেয়া আবার বলে, 'কী হল ? কেমন আছ তুমি বললে না ?'

বৈশাখী ধীরে-ধীরে বলে, 'না। ভাল নেই আপু।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা শেষ হতেই বলে, 'ভাল নেই কেন ? শরীর খারাপ তোমার ?'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'না, শ্রেয়া আপু। শরীর খারাপ না।'

শ্রেয়া বলে, 'তাহলে ! তাহলে কী হয়েছে তোমার !'

শ্রেয়ার কথা শুনে তখনই কিছু বলে না। এক মুহূর্ত থেমে থাকে। তারপর বলে, 'শ্রেয়া আপু, আপনার সঙ্গে দু-এক দিনের মধ্যে, ভাইয়ার কি কখনও কোথাও দেখা হয়েছে ?'

অজানা আশংকায় দুলে ওঠে। একটা প্রশ্নই সামনে এসে দাঁড়ায়, ভাল আছে তো সেলিম ! শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন, বৈশাখী !'

বৈশাখী বলে, 'কোনও কারণ নেই, শ্রেয়া আপু। ধরুন এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা আর না করে পারে না। বলে, 'তোমার ভাইয়া কেমন আছে, বৈশাখী ? ভাল আছে তো ?'

বৈশাখীকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বোধহয় ভাবতে হয় না। সে দ্রুত বলে, 'না, নেই। ভাইয়া ভাল নেই। একটুও ভাল নেই ভাইয়া।'

কী হয় কে জানে! কথা বলতে-বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বৈশাখী।

বৈশাখীকে হঠাৎ এভাবে কাঁদতে দেখে এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না সে। অজানা এক আশংকায় ব্যাকুল হয়ে শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'কী হয়েছে বৈশাখী !'

বৈশাখী কাঁদে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে কোনওমতে বলে, 'গতকাল বিকেল থেকে ভাইয়া কেমন যেন করছে। সেই যে বিকেলে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করেছে, এখনও দরজা বন্ধ করেই আছে। সারারাত একটুও ঘুমায়নি। কিছু খায়ওনি। টেবিলের বই-খাতা সব ঘর থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

উৎকণ্ঠিত শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন। বই-খাতা সব ফেলে দিয়েছে কেন তোমার ভাইয়া ?

শ্রেয়ার কথা শুনে বৈশাখী বলে, 'ভাইয়া নাকি পরীক্ষা দেবে না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় শ্রেয়া এতই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে বুঝতে পারে না।

শ্রেয়াকে টেলিফোনের অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকতে দেখে, বৈশাখী আবার বলে, 'আমাদের বাড়িতে গতকাল সারারাত কেউ একটুও ঘুমায়নি। খায়ওনি, জানেন ? শ্রেয়া আপু, আমাদের স্বপ্ন বলুন, ভালবাসা বলুন, এই পৃথিবীতে ঐ একজনই। মা-বাবা ভাইয়াকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখছেন !'

বৈশাখীর কথা শুনে শ্রেয়া কী ভেবে হঠাৎ বলে, 'তুমি স্বপ্ন দেখনি ?'

শ্রেয়ার এ প্রশ্ন শুনেই আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। না, এ প্রশ্নের উত্তরে আর কিছু বলতে পারে না।

বৈশাখীকে এভাবে কাঁদতে দেখে, নিজেরও দু'চোখ জলে ভরে গেছে টের পায়। শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'তোমার ভাইয়াকে তুমি বোঝাও বৈশাখী।'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'বুঝিয়েছি। অনেক বুঝিয়েছি। মা-বাবা, আমি কত বুঝিয়েছি, সে কথা বলে আপনাকে শেষ করতে পারব না, শ্রেয়া আপু।'

বুঝতে পারে বৈশাখীর কথা শুনে, তার নিজেরও দু'গণ্ড বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে। শ্রেয়া নিজেকে সংবরণ করে, শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে কোনওমতে বলে, 'এমন মেধাবী একজন মানুষ। ওনাকে তো এত অবুঝ হলে চলবে না বৈশাখী।'

শ্রেয়ার কথা শুনে বৈশাখী বলে, 'একটা কথা বলব, শ্রেয়া আপু ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বলো, বৈশাখী ?'

বৈশাখী বলে, 'আমি, মা, বাবা কেউ ভাইয়াকে অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি। আমার ধারণা, এ পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষ আছেন,

যিনি ভাইয়াকে বোঝাতে পারবেন।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা শুনে দ্রুত বলে, 'কে ? তুমি কার কথা বলছ বৈশাখী ?'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই অপরপ্রান্ত থেকে বৈশাখী বলে, 'আপনি। হ্যাঁ, শ্রেয়া আপু। আমি আপনার কথা বলছি।'

শ্রেয়া বৈশাখীর কথা শুনে হতবাক হয়ে বলে, 'কী বলছ তুমি, বৈশাখী ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৈশাখী বলে, 'শ্রেয়া আপু, জানেন তো, মেয়েরা কিন্তু অতি অল্প বয়সেই অনেক কিছু বুঝতে শেখে। সেই ছোটবেলা থেকেই তো ভাইয়াকে দেখছি। জীবনে কখনও মা-বাবার অবাধ্য হয়নি। আমার কোনও কথা, কোনও আবদার কখনও ফেলেনি। সেই শান্তশিষ্ট ভাইয়া আজ কারও কোনও কথা শোনা তো দূরের কথা, উন্মাদের মতো যা-তা আচরণ করছে।'

একটানা কথা বলে টেলিফোনের অপরপ্রান্তে বৈশাখীকে থামতে দেখেই, শ্রেয়া বলে, 'তা আমি কী করতে পারি, তুমিই বলো বৈশাখী ?'

বৈশাখী বলে, 'আমি জানি, ভাইয়া আপনাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসে বললে ভুল বলা হবে, আমি জানি নিজের জীবনের চেয়েও আপনাকে বেশি ভালবেসে ফেলেছে ভাইয়া। তাই বলছিলাম, এ পৃথিবীতে সবাইকে ফিরিয়ে দিলেও, ভাইয়া আপনাকে ফেরাবে না। আপনার কথা ভাইয়া রাখবেই।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'আমি বলছিলাম কী বৈশাখী–'

কথা শেষ করতে পারে না শ্রেয়া। তার আগেই বৈশাখী বলে, 'আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, শ্রেয়া আপু। মিনতি করছি। একটা অসহায় পরিবারকে বাঁচান আপনি।'

কথা শেষ করে আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে বৈশাখী।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে বৈশাখীকে এভাবে কাঁদতে দেখে, নিজের ভেতরটাও দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বুঝতে পারে, নিজের দু'চোখও আবার জলে ভরে উঠেছে। নিজেকে সংযত করে, শ্রেয়া বলে, 'তুমি এখন আমাকে কী করতে বলো, বৈশাখী ?'

বৈশাখী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। কেঁদে বলে, 'কেউ না জানুক, অন্তত আপনিতো জানেন, ভাইয়া আপনাকে কতটা ভালবেসে ফেলেছে। আপনি এও তো জানেন, ভাইয়া কারও কথা না রাখলেও, আপনার কথা রাখবে, শ্রেয়া আপু। আপনি ভাইয়াকে একটু বোঝান। আমি জানি, ভাইয়া আপনার কথায় না করতে পারবে না।'

বৈশাখীর কথা শুনে, টেলিফোন কানে ধরে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর শ্রেয়া বলে, 'তোমার ভাইয়াকে একটু ডেকে দেবে, বৈশাখী ? আমি ওনার সঙ্গে কথা বলব।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, বৈশাখীর যেন খুশির অন্ত থাকে না। অফুরন্ত আনন্দে বৈশাখী বলে, 'আপনি প্লিজ একটু অপেক্ষা করেন। আমি ভাইয়াকে এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি, শ্রেয়া আপু। এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি।'

কথা বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না। ছুটে যায়।

টেবিলের ওপর টেলিফোন রেখে যাওয়ায়, সব শুনতে পায় শ্রেয়া। দ্রুত বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে, দরজায় বেশ জোরে-জোরে আঘাত করে বৈশাখী বলে, 'ভাইয়া, ও ভাইয়া শোনো। শ্রেয়া আপু টেলিফোন করেছেন। তোমার সাথে কী নাকি জরুরি কথা আছে, ভাইয়া। জলদি এসো।'

গতকাল বিকেল থেকে সেই যে দরজা বন্ধ করেছে, আর খোলেনি। বেশ ক'টা টেলিফোন এলে, বৈশাখী ডেকেছে ঠিকই, কিন্তু এসে টেলিফোন ধরেনি।

কিন্তু এবার এমনই একজন মানুষের টেলিফোন, দরজা খুলে এসে টেলিফোন ধরতেই হয়।

টেলিফোন ধরে 'হ্যালো' বলতেই শ্রেয়া বলে, 'আমি শ্রেয়া।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'বলেন ?'

'বলেন' শব্দটা স্বভাবতই অন্তরের মধ্যে গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হয়। দ্রুত বলে, 'আপনি হঠাৎ আবার আমাকে এসব কী বলছেন ! চাইনিজে জোর করে হলেও কিন্তু একবার নয়, একাধিকবার তুমি বলেছেন আপনি।'

বিদ্রূপ করে হলেও সেলিম খানিক হাসে। হেসে বলে, 'তাই নাকি ! বলেছিলাম নাকি !'

সেলিমের বিদ্রূপ গায়ে মাখে না। এখন এসব গায়ে মাখার সময়ও নয়। তাই বলে, 'তা কেমন আছেন আপনি, বলেন ?'

সংক্ষিপ্ত বলে, 'না, নেই। ভাল নেই।'

দ্রুত বলে শ্রেয়া, 'কেন ? ভাল নেই কেন ?'

শ্রেয়ার এ প্রশ্নের উত্তরে খানিক বোধহয় কী ভাবে ! তারপর বলে, 'আপনার কি মনে হয়, একজন মৃত মানুষ ভাল থাকতে পারে কখনও ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'আপনি মরে গেছেন নাকি! নিজেকে মৃত বলছেন কেন ?'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, দ্রুত বলে সেলিম, 'আপনার কি মনে

হয়, এখনও বেঁচে আছি নাকি আমি !'

সেলিম থামতেই শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কী বলছেন এসব আপনি ! আপনার মাথা ঠিক আছে তো !'

বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বলে, 'স্বপ্ন নেই। ভালবাসা নেই। চাওয়া-পাওয়া কিচ্ছু নেই। মরে যাওয়া না তো, কী বলেন ? তা কেন টেলিফোন করেছেন, বলেন ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'আপনি নাকি পরীক্ষা দিচ্ছেন না ?'

সেলিম বলে, 'কে বলেছে ? বৈশাখী নিশ্চয়ই। কী অদ্ভুত, পৃথিবীতে সবাই আমাকে ভাল না বাসলেও, এই মেয়েটা আমাকে এত ভালোবাসে কেন, বুঝি না !'

সেলিম থামতেই শ্রেয়া আবার বলে, 'কে বলেছে সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। কথাটা সত্যি কি না, সেটাই বড়।'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই শ্রেয়া বলে, 'কেন ! কী হয়েছে আপনার ! কেন পরীক্ষা দেবেন না আপনি, বলেন ?'

সেলিমের কী হয় কে জানে ! দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'কেন বলব আপনাকে! কে আপনি।'

টেলিফোনে সেলিমের কথা শুনে যেন থ' হয়ে যায়। হতবাক হয়ে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কী বলছেন এসব, আপনি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সেলিম উত্তেজনায় বোধহয় থরথর করে কাঁপতে থাকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, তাই। কে আপনি ! আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক যে, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। বলুন, আছে কোনও সম্পর্ক ?'

সেলিম খুব রেগে গেছে দেখে, শ্রেয়া গলার স্বর আরও নরম-মোলায়েম করে বলে, 'আপনার মা-বাবার ভালবাসা আপনি, স্বপ্ন আপনি। তাঁরা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আর বৈশাখী যে কী পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছে, তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন আপনি।'

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে সেলিম বিদ্রূপাত্মক হাসে। হেসে বলে, 'যার কষ্ট পাওয়া আমি চাই, যে কষ্ট পেলে আমি খুশি হই, কই, সে তো কষ্ট পাচ্ছে না! যার জন্যে জীবন মূল্যহীন হয়ে গেল, সে কিন্তু বেশ আছে ! দিব্যি টেলিফোনে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছে আমার সঙ্গে !'

কী ভেবে শ্রেয়া হঠাৎ বলে, 'আমার ওপর খুব রাগ করেছেন আপনি ? ক্ষেপে-টেপে আগুন হয়ে আছেন, না ?'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই সেলিম দ্রুত বলে, 'না। রাগ করব কেন ! রাগ করার কি কোনও কারণ আছে, বলেন ! হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি। এত খুশি হয়েছি যে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

শ্রেয়া আবার বলে, 'এত রাগ আমার ওপর !'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'আমি আপনার কে ! আমি রাগ করলে আপনার কী এসে যায়, বলুন ? আমাকে নিয়ে এত ভাবারই বা সময় কোথায় আপনার !'

সেলিমের কথা শুনেই শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বুঝতে পারছি। খুব রাগ করেছেন।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হলেও একমুহূর্ত নিশ্চুপ থাকে। খানিক বোধহয় কী ভাবে ! তারপর বলে, 'শুধু রাগ করেছি এটা বুঝেছেন, তাই না ? মানুষের ওপর থেকে, পৃথিবীর ওপর থেকেই যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, এটা বোঝেননি ? একটা সত্যি কথা বলব আপনাকে ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বলুন ?'

সেলিম বলে, 'আসলে বেঁচে থাকারই আর কোনও সাধ নেই আমার, জানেন ?'

সেলিমের কথা শুনে আঁতকে ওঠে শ্রেয়া ! দ্রুত বলে, 'কী বলছেন এসব আপনি ! আপানার কি মাথা খারাপ হয়েছে !'

শ্রেয়ার কথা শুনে, অপরপ্রান্ত থেকে সেলিম বলে, 'গতকাল বিকেল থেকেই নিজের জীবনের ওপর, সারা পৃথিবীর ওপরই দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে আমার। বিকেল থেকে আরম্ভ করে রাতভর ভেবে শেষমেষ কি ঠিক করেছি, জানেন ?'

সেলিম থামতেই শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কী ঠিক করেছেন, বলেন ?'

সেলিম বলে, 'ঠিক করেছি মরে যাব। হ্যাঁ, এখন বোধহয় সত্যি আমার মরে যাওয়াই ভাল।'

অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে শ্রেয়ার। দ্রুত বলে, 'কী বলছেন এসব আপনি!'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'কেন বাঁচব, বলেন ? কিসের জন্যে বাঁচব, বলেন ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন বাঁচবেন না, সেটা বলেন ?'

মনে হয় গলা সামান্য ধরে আসে। সামান্য হলেও বোধহয় কেঁদে ফেলে। নিজেকে সংবরণ করার জন্যে হলেও খানিক থামে সেলিম। তারপর বলে,

'জীবনে প্রেম নেই, স্বপ্ন নেই। যাকে চাই, তাকে পাব না। এ কেমন জীবন, বলুন ? তার চেয়ে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়, বলুন আপনি ?'

সেলিমের এ অবস্থা দেখে শ্রেয়া সত্যি যার-পর-নাই ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে দ্রুত বলে, 'একটা অনুরোধ করব আপনাকে, রাখবেন ?'

শ্রেয়ার এ কথা শুনে সেলিম বলে, 'এমন কোনও অনুরোধ করবেন না প্লিজ, যে অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই বলে, 'কাল আপনি আমাকে কাকরাইলে একটা চাইনিজে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে আপনার ?'

সেলিম টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে বলে, 'মনে থাকবে না কেন ? মনে আছে।'

শ্রেয়া বলে, 'কাল আপনি আমাকে ডেকে ওখানে নিয়ে গেছেন। আজ আমি আপনাকে ওখানে ডাকছি। ঠিক একই সময়ে, একই স্থানে, কাল আপনি ডেকেছেন। আজ আমি ডাকছি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম অবাক না হয়ে পারে না। দ্রুত বলে, 'তা হঠাৎ এত ডাকাডাকি কেন, বলুন তো ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'কাল আপনি বলেছেন। আমি শুনেছি। আজ আমি বলব। আপনি শুনবেন। কি, আসবেন না আপনি ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই বলে, 'হ্যাঁ, আসব।'

টেলিফোনে ওপ্রান্ত থেকে সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'খুশি হলাম।'

শ্রেয়ার মুখে 'খুশি হলাম' শুনে, সেলিম বলে, 'একটা কথা বলি ?'

শ্রেয়া বলে, 'বলুন ?'

সেলিম বলে, 'আপনাকে খুশি করার জন্যে আমি সব করতে পারি, এটা বোঝেন না আপনি ? তাই বলছি, আজ দুপুর বেলা এমন কোনও কথা বলবেন না, এমন কোনও অনুরোধ করবেন না, যাতে আমি খুশি না হয়ে, অখুশি হই। হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। আমি নিশ্চয়ই আসব।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'আপনি খুশি হবেন, না কষ্ট পাবেন জানি না। এটা তো জানেন, সত্য গোপন করা, আর মিথ্যে বলা এক। হ্যাঁ। আমি অকপটে আমার জীবনের কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা, কিছু কথা আজ আপনাকে বলব। আমি জানি, আমার সব শুনে আপনি আর আমাকে ভালবাসা তো দূরের কথা, উল্টো ঘৃণা করাও শুরু করতে পারেন।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বোধহয় এবার রেগেই যায়। রেগে বলে, 'ঘৃণা করব আমি আপনাকে ! কাল আপনাকে কি বলেছিলাম, মনে আছে আপনার ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কী ?'

সেলিম দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'বলেছিলাম, আপনি পাথর। আজও সে কথাই বলছি। আপনি সত্যি, মানুষ না। পাথর।'

শ্রেয়া ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'আগে পুরোটা শুনুন। তারপর দেখা যাবে, কে পাথর, কে রক্ত মাংসের মানুষ। গতকালের একই টেবিলে বসে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষায় থাকব। ঠিক একটার মধ্যে চলে আসবেন, কেমন ?'

সেলিম কেন যেন আর কথা বাড়ায় না। বলে, 'ঠিক আছে। আসব।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শেষ হতেই 'খোদা হাফেজ' বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই হঠাৎ মনে হয়, সেলিমকে এভাবে ডাকা কি ঠিক হল !

আবার ভাবে, একটা মানুষ তারই কথা ভেবে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তাকে ফেরাবে না সে ! তাকে বোঝাবে না সে, তা কী করে হয় !

শ্রেয়া ঠিক পৌনে একটার সময় চাইনিজে পৌঁছে দেখে, সেলিম তার আগেই গতকালের ঐ একই টেবিলে এসে বসে আছে।

মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসে বলে শ্রেয়া, 'কখন এসেছেন ?'

সেলিম বলে, 'আধ ঘণ্টা হল।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'আমি কিন্তু একটার মধ্য আসতে বলেছিলাম।'

শ্রেয়ার এ কথায় সেলিম বোধহয় সামান্য হলেও লজ্জা পায়। বলে, 'ইয়ে মানে, আমি বোধহয় একটু আগেই এসে পড়েছি।'

শ্রেয়া এবার বলে, 'কী খাবেন, বলেন ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কিছু না।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে বলে, 'কিছু না, মানে ! কী বলছেন আপনি !'

সেলিম বলে, 'আমি বাংলায় বলেছি। আপনার বুঝতে না পারার কথা নয়। আমি খেতে আসিনি। আপনি কী বলবেন, তা শুনতে এসেছি।'

শ্রেয়া জানে, বেসামাল হয়ে গতকাল দুপুরের পর থেকে কিছু খায়নি। তাই দ্রুত বলে, 'আপনি কাল বেবিট্যাক্সিতে উঠতে বলেছেন। আমি কোনও কথা বলিনি। উঠেছি। এখানে এসেছি। আপনি অর্ডার দিয়েছেন। আমি নিষেধ করিনি। খেয়েছি। কি, খাইনি ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, খেয়েছেন।'

শ্রেয়া বলে, 'তো আপনি খাবেন না কেন, বলেন ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথার পিঠে আর কোনও কথা বলতে পারে না। তাই বলে, 'বুঝতে পেরেছি। আমি খাব। তা আপনি অর্ডার দিচ্ছেন, দিন। কিন্তু বিলও কি আপনি পেমেন্ট করবেন ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'অসুবিধা আছে ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'আপনি বিল দেবেন, তা কী করে হয় ! আপনি মেয়েমানুষ—'

মুখের কথা শেষও করতে পারে না সেলিম। যেন ফোঁস করে ওঠে শ্রেয়া। মুখ থেকে ছো মেরে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'আপনি না শিক্ষিত ! মেধাবী ! মানুষকে মানুষ ভাবতে পারেন না ! মেয়ে মানুষ, আর পুরুষ মানুষ, দু'ভাগে ভাগ করে দেখার দরকার কী ! আপনার মতো মেধাবী একজন মানুষও যখন একথা বলেন, তখন মনে হয়, সত্যি মেয়েরা বোধহয় চিরকাল মেয়েমানুষই থেকে যাবে। মানুষ আর হতে পারবে না কখনওই।'

সেলিম শ্রেয়ার রেগে যাওয়া দেখে বলে, 'ঠিক আছে। অর্ডার আপনি দেবেন। বিলও আপনি দেবেন, হল ?'

শ্রেয়া বলে, 'না, হয়নি। অর্ডার আপনি দেবেন। বিল আমি দেব।'

কী আর করে, সেলিমকেই অর্ডার দিতে হয়।

বয় অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই সেলিম বলে, 'এবার বলুন ? কেন ডেকেছেন, বলুন ?'

শ্রেয়া বলে, 'অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই। এসেছেন, বসুন। বলব বলেই তো ডেকেছি আপনাকে।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বোধহয় প্রতিবাদ না করে পারে না। বলে, 'আমি অধৈর্য হয়েছি, কে বলল আপনাকে !'

চাইনিজের এই আলো-অন্ধকারে শ্রেয়া সেলিমের দিকে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আপনি কি বলেন, অধৈর্য হননি আপনি ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'অধৈর্য হব কেন ? কী বলছেন আপনি ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, খানিক কী যেন ভাবে! তারপর বলে, 'গতকাল বিকেল থেকে আপনি যা আরম্ভ করেছেন, একে কি সুস্থ আচরণ বলা যায়, বলেন ? তারপরও আপনি যদি বলেন আপনি সব ঠিকই করছেন, আমার কিছু বলার নেই।'

সেলিমের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! টেবিলে একটা মৃদু চাপড় মেরে বলে, 'হ্যাঁ। আমি সুস্থ নই। একেবারে সুস্থ নই। বলা যায়, পাগলই বোধহয় হয়ে যাব আমি। কিন্তু কেন আমি এমন করছি ! কার জন্যে, কিসের জন্যে আমি এমন উন্মাদের মতো আচরণ করছি, বলেন ?'

সেলিমের এত উত্তেজিত হওয়া দেখে, শ্রেয়া হঠাৎ কী ভেবে মুচকি হেসে বলে, 'আচ্ছা, জোর জবরদস্তি করে ভালবাসা হয় ? জোর করে একটা মেয়ের

মন পাওয়া যায় ? যদি বলি, আপনার সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই, আমি একজনকে ভালবাসি।'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না শ্রেয়া। বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে, সেলিম আবার টেবিল চাপড়ে বলে, 'না। এ হতে পারে না। কিছুতেই না।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বেশ মজা পায়। বলে, 'কেন হতে পারে না, বলেন ?'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'না। আপনি আমাকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে ভালবাসতে পারেন না। এ আমার সাফ কথা।'

শ্রেয়া মুচকি হেসে বলে, 'কেন ? ভালবাসতে পারব না কেন, বলেন ?'

সেলিম উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'কারণ, আপনি আমার। শুধু আমার। আর কারও অধিকার নেই আপনাকে পাবার।'

শ্রেয়া ভেতরে-ভেতরে মজা পায়। বলে, 'একে কি বলে, জানেন ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কী ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'জোর যার, মুল্লুক তার।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'আপনাকে কেন ভালবাসি, কিসের জন্যে এত ভালবাসি, কিচ্ছু জানি না। সোজা কথা, আপনাকে ভালবাসার জন্যে কোনও বিধি-নিষেধ, কোনও নিয়ম, জীবনের কোনও হিসেব-নিকেশ আমি মানি না, মানব না। আমার মন-প্রাণ আপনাকে চায়। আমি আপনাকে ভালবাসি। ব্যস।'

সেলিমের কথায় শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'বুঝিনি আবার ! বেশ বুঝতে পারছি, মাথাটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। তা যে কথা বলছিলাম, আমি কিন্তু একজনকে ভালবাসি। ভালবাসি মানে, খুব ভালবাসি। তাকে বাদ দিয়ে, আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না। সেলিম বলে, 'বলেছি তো, আমি আপনাকে ভালবাসি। আমাকে ছাড়া, আপনি আর কাউকে ভালবাসতে পারেন না।'

শ্রেয়া মুচকি হেসে বলে, 'যদি ভালবাসি ?'

সেলিম অসহায়ের মতো বলে, 'সত্যি বলছেন ! সত্যি বলছেন আপনি !'

শ্রেয়া বলে, 'যদি বলি, হ্যাঁ। ভালবাসি, তাহলে ?'

অসহায়ের মতো মাথা নিচু করে খানিক বসে থাকে। মনে হয় এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে কী যেন ভাবে! তারপর বলে, 'একটা অনুরোধ করব, রাখবেন ?'

শ্রেয়া বলে, 'বলুন ? রাখার মতো কথা হলে নিশ্চয়ই রাখব।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আপনি ওনার নাম-ঠিকানা, সব দয়া করে দেবেন আমাকে ?'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া অবাক না হয়ে পারে না। অবাক হয়ে তাই বলে, 'নাম-ঠিকানা চাইছেন যে ! নাম-ঠিকানা পেলে কী করবেন আপনি !'

এ প্রশ্নের উত্তরে সেলিম খানিক মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'দেখা করব।'

শ্রেয়ার কৌতূহলের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। দ্রুত বলে, 'দেখা করবেন মানে ! দেখা করে কী করবেন !'

আবার মনে হয় খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আমি ওনাকে অনুরোধ করব।'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'কী অনুরোধ করবেন আপনি ?'

এই আলো-অন্ধকারের মধ্যেই মাথা তুলে খানিক তাকিয়ে শ্রেয়াকে দেখে। তারপর বলে, 'আমি ওনার কাছে মিনতি করব, ভিক্ষে চাইব।'

শ্রেয়া বুঝতে পারে না, তা নয়। তবু বলে, 'কী ভিক্ষে চাইবেন ?'

না, শ্রেয়ার এ প্রশ্নের উত্তরে কেন যেন নিশ্চুপ থাকে। কিছু বলে না।

সেলিমকে নিশ্চুপ দেখে শ্রেয়া আবার বলে, 'কই, বললেন না ? কী ভিক্ষে চাইবেন ?'

সেলিম বলে,'আপনাকে।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'আমাকে ! কী বলছেন আপনি !'

সেলিম আবার বলে, 'হ্যাঁ। আপনাকে ভিক্ষে চাইব আমি ওনার কাছে। বলব, আমার শ্রেয়াকে আপনার কাছে ভিক্ষে চাই আমি।'

শ্রেয়া বুঝতে পারে, ভেতরটা এক অপরিসীম ভাল লাগায় ভরে গেছে তার। সে দ্রুত বলে, 'আমার শ্রেয়া বলছেন কেন আপনি ? শ্রেয়া তো ওনার।'

শ্রেয়ার কথা শুনে কী হয় কে জানে ! উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'না। শ্রেয়া আমার। শুধু আমার। বলেছি তো, এই পৃথিবীতে শ্রেয়া আর কারও নয়। কেবল আমার।'

শ্রেয়ার ভেতরটা অন্তহীন খুশিতে ভরে গেলেও, কেন যেন আরও শুনতে মন চায় তার। তাই বলে, 'যদি রাজি না হয়, তাহলে কী করবেন ? তাছাড়া

রাজি হবেই বা কেন ? সেও তো ভালবাসে, নাকি ?'

এই আলো-অন্ধকারে আবার মুখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলেন, 'কী করব জানি না। তবে আমাকে ফিরিয়ে দিলে তো ওনার চলবে না। তাই ভয়ঙ্কর কিছু যে করব, এটা বলতে পারি।'

শ্রেয়া মুচকি হেসে বলে, 'কী করবেন ?'

সেলিম এক মুহূর্ত ভাবে। ভেবে বলে, 'কী আর করব ! প্রয়োজনে খুন করে ফেলব।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'খুন করলে কি হয়, জানেন ? ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়, বুঝেছেন ?'

সেলিম বলে, 'এক কথাই হল।'

সেলিমের কথা শ্রেয়ার বোঝার কথা নয়। বুঝতে পারেও না। তাই বলে, 'আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী বলছেন আপনি ! এক কথা হল, মানে।'

সেলিম বলে, 'এক কথাই তো। আজ আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, আমি কী করব, বলুন ? আজ অথবা কাল কিংবা পরশু বিষ খেয়ে মরে যাব, এই তো ? কাউকে খুন করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে মরতে হলেও তো, সেই একই– মরণই হল। মৃত্যু তো আর আমাকে ছাড়ছে না। তাই পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। যেভাবেই হোক, মরলেই হল।'

ঠিক এসময় বয় গরম স্যুপের বাটি, দু'জনের সামনের টেবিলে রেখে যায়। শ্রেয়া সেলিমের সামনের বাটিতে প্রথমে স্যুপ দেয়। পরে নিজেও নিয়ে বলে, 'নিন, খান।'

সেলিম বলে, 'আপনি আগে ওনার নাম-ঠিকানা দিন।'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'কার নাম-ঠিকানা ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আপনি যাকে ভালবাসেন। যে আপনাকে ভালবাসে।'

শ্রেয়া এবার আর নিঃশব্দে নয়, শব্দ করেই হাসে। হেসে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, আমি আবার কাকে ভালবাসি ! তাছাড়া, আমার মতো একটা মেয়েকে কে ভালবাসতে যাবে, বলুন !'

কথা বলতে গিয়ে, শুরুতে হাসে ঠিকই, কিন্তু শেষমেষ গলা ধরে আসে শ্রেয়ার।

সেলিম দ্রুত বলে, 'তার মানে ! কী বলছেন আপনি ! আমি কিন্তু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়া সেলিমের কথার জবাব দিতে গিয়ে আনমনে বলে, 'না। কেউ এতটুকু ভালবাসেনি। ভালবাসা তো দূরের কথা, ভালবাসার মানুষ বলে কেউ জীবনে আজও আসেওনি। এসব শুধু মজা করার জন্যে, এমনি বললাম।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম সামান্য হলেও স্বস্তি পায়। তাই আর কথা বাড়ায় না। গরম স্যুপের বাটি টেনে নিয়ে বলে, 'আমি খাচ্ছি। আপনিও খান।'

দু'জনে খায়। রেস্তোরাঁর মিউজিক সেন্টারে সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে।

সেলিমের কী হয় কে জানে ! বলে, 'শুনুন, আপনাকে আর আমি আপনি বলতে পারব না। এখন থেকে আবার আপনি না বলে, তুমি বলি, কেমন ?'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'সত্যি, এমন পাগল মাথায় কী করে যে আপনি সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হন, বুঝি না ! এখন আপনি, তো তখন তুমি, তাই না ! এ যেন আপনি-তুমি খেলা শুরু করেছেন !'

সেলিম দ্রুত বলে, 'অনুমতি দেবেন না আপনি ? খুব ইচ্ছে করছে, আবার তুমি বলতে।'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'কাল কিন্তু জোর খাটিয়ে, আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করেই তুমি বলেছেন। কি, বলেননি ? আজ হঠাৎ এত অনুমতি চাইছেন যে ?'

সেলিম কেন যেন এ কথার উত্তরে কিছু বলে না।

শ্রেয়াই আবার বলে, 'আমি কিন্তু আমার কথা এখনও শুরু করিনি।'

সেলিম কেন যেন এবারও কিছু বলে না। চুপ করে থাকে।

স্যুপ খাওয়া হয়ে যায়। বয় এসে স্যুপের বাটি সরিয়ে নিয়ে, খাবার সাজিয়ে দিয়ে যায়। খেতে-খেতে সেলিম এবার বলে, 'একটা কথা বলি শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া বলে, 'বলেন ?'

সেলিম বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। জানি না, তুমি কেন ডেকেছ ! কী বলতে চাও ! কিন্তু আমি বলছিলাম কী শ্রেয়া, এসব না বললে হয় না ? তারচে' এসো, সব বাদ দিয়ে আমরা দু'জন-দু'জনকে ভালবাসি। স্বপ্ন দেখি। একটা সুন্দর ছিমছাম ঘর বাঁধার স্বপ্ন।'

শ্রেয়া বলে, 'না। এ হয় না। আমাকে সব বলতেই হবে।'

সেলিম বলে, 'কেন ? বলতে হবে কেন ?'

শ্রেয়া ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'বারে, আমার সম্পর্কে জানতে হবে না আপনাকে ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আমি যদি জানতে না চাই, তাহলেও বলবে তুমি ?'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, বলব। কারণ, আমাকে যে সব খুলে বলতেই হবে।'

সেলিম বলে, 'কেন, শ্রেয়া ! কেন ! আমি জানতে চাই না, তবু তোমাকে বলতে হবে কেন !'

শ্রেয়া ম্লান হেসে বলে, 'সব শুনে তারপর তো আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। ভালবাসবেন, না ঘৃণা করবেন।'

সেলিম দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'সিদ্ধান্ত তো আমি নিয়েই রেখেছি।'

শ্রেয়া বলে, 'সে সিদ্ধান্ত তো সব শুনে, আপনার পাল্টে যেতেও পারে !'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম অনেক কষ্টেও বোধহয় ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না শ্রেয়া, আমার সারা পৃথিবী আজ একদিকে, আর অন্যদিকে তুমি। আমি সব ছাড়তে পারি। কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারি না।'

এত প্রেম, এত হৃদয় উজাড় করা ভালবাসার কথা শুনলে, কার না ভাল লাগে! শ্রেয়ারও অন্তর অন্তহীন খুশিতে ভরে যায়। কিন্তু ভেতরের একটু খুশিও দেখায় না। বলে, 'কিন্তু আমার কি মনে হয়, জানেন ?'

দ্রুত বলে সেলিম, 'কী ?'

শ্রেয়া বলে, 'আমার জীবনের পুরোটা শুনলে আপনার এই যে, এত ভালবাসা তা থাকবে না।'

সেলিমের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! দাঁতে দাঁত চেপে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'তুমি ভুল বলেছ, শ্রেয়া। আমার ভালবাসা চিরদিন থাকবে। চিরকাল থাকবে। তুমি বললেও থাকবে, না বললেও থাকবে।'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই, শ্রেয়া বলে, 'তাহলে আমার জীবন, আমার অতীত শুনতে এত আপত্তি কেন আপনার ?'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, সেলিম দ্রত বলে, 'কারণ, আমি এখন থেকে, এই বর্তমান থেকেই তোমাকে ভালবেসেছি। তোমার অতীত, তোমার গতকালের, পরশুর বা আগের কোনও ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র কোনও আগ্রহ নেই।'

শ্রেয়া সেলিমের কথার প্রতিবাদ না করে পারে না। বলে, 'অতীত ছাড়া কিন্তু আজকের এই আমি নই। ফেলে আসা ঐ অতীতও কিন্তু আমার জীবন। জীবনের অংশ। আমি কি মিথ্যে বলেছি, বলুন আপনি ?'

কী হয় কে জানে ! সেলিম খাওয়ার প্লেট থেকে মুখ তুলে, খানিক তাকিয়ে থেকে বলে, 'না বললে হয় না ? শ্রেয়া, আমি তোমার কাছে মিনতি করছি। আমার কথা তুমি রাখবে না, বলো ?

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে দ্রুত বলে, 'না। আপনার এ কথা আমি রাখব না। কিছুতেই না। কারণ, একটু-একটু করে আমিও আপনাকে ভালবাসতে শুরু করেছি যে।'

সেলিমের শরীরের বহতা রক্তের মধ্যে দ্রুত অন্তহীন এক খুশির যেন জোয়ার বয়ে যায়। না, কী বলবে না বলবে কিছুই আর বুঝতে পারে না সে। তাই অস্ফুট স্বরে কেবল বলে, 'শ্রেয়া ! সত্যি তুমি আমাকে ভালবেসেছ তো, শ্রেয়া !'

খানিক আনমনে কী যেন ভাবে ! তারপর ধীরে-ধীরে বলে, 'নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শেষমেষ হেরে গিয়ে স্বীকার করছি, আমিও ভালবেসে ফেলেছি। হ্যাঁ, এত ভালবাসার বিনিময়ে, ভাল না বেসে সত্যি বোধহয় পারা যায় না।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, চোখ-মুখ জুড়ে থাকা অন্ধকার কোথায় উধাও হয়ে যায়, কে জানে ! মন-প্রাণ সব অপরিসীম এক খুশিতে 'নাচ ময়ূরী নাচ' বলে, যেন নেচে ওঠে। দ্রুত বলে, 'একটা কথা বলি ?'

শ্রেয়া বলে, 'বলুন ?'

'আমাকে তুমি বলা যায় না, শ্রেয়া ?'

সেলিমের কথা শুনে খেতে-খেতেও হাসে শ্রেয়া। বলে, 'এমন মগজ-ঘিলু নিয়ে আপনি সেই ছোট বেলা থেকে কী করে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হন, বলুন তো ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'কেন ! কী হয়েছে শ্রেয়া ! তুমি তো বললে, ভালবাস। তাই এখন থেকে তুমি বললে কী এমন ক্ষতি হয় ?'

শ্রেয়া এক মূহূর্ত কী যেন ভাবে ! ভেবে বলে, 'আগে আমার পুরোটা জানুন। তারপর দেখা যাবে, কে কাকে তুমি বলে ! এমনও তো হতে পারে, এই যে কাল দুপুর থেকে আপনি-তুমি খেলা শুরু করেছেন, সে খেলায় আবার আপনি তুমি থেকে আপনি বলা শুরু করে দিলেন।'

সেলিম খাওয়ার প্লেট থেকে আবার মুখ তুলে তাকায়। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'না শ্রেয়া, না। তোমার জীবনের যত কঠিন, যত নির্মম ঘটনাই বলো না কেন, আমি আমার প্রেম থেকে নড়ব না। একচুলও নড়ব না। কারণ, আমার ভালবাসার চেয়ে বড় আর আমার কাছে কিছু নেই, শ্রেয়া।'

সেলিমের কথায় শ্রেয়া ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ। আমার জীবনের কঠিন আর নির্মম ঘটনা আমি আজ আপনাকে বলব। তবে শুধু কঠিন আর নির্মমই নয়। লজ্জার। হ্যাঁ, বড় লজ্জারও।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'লজ্জার !'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, লজ্জার। বড় লজ্জার। সব শুনে হয়তো ঘৃণা করবেন। তবু বলছি, শুনুন। বাংলাদেশের হাজারো গ্রামের মতো এক গ্রাম, নাম জিরতলী। দীঘি ছিল, পুকুর ছিল, মসজিদ-মন্দির ছিল, স্কুল ছিল, মাদ্রাসা ছিল, ভাল মানুষ ছিল, মন্দ মানুষও ছিল। পরোপকারী মানুষের যেমন কমতি ছিল না, আবার ভোটচোর, রিলিফ চোর মেম্বার, গ্রাম্য টাউট-বাটপারের অভাব ছিল না। হ্যাঁ, এই জিরতলী গ্রামেই আমার জন্ম।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'বাপরে, একেবারে কখন-কোথায় জন্মেছ না জন্মেছ, সব বলা শুরু করেছ ! কে শুনতে চায় শ্রেয়া, তোমার কাছে তোমার এই সব কাসুন্দি !'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'না বললে চলবে কেন ? জন্ম থেকেই আমার জীবনের শুরু যে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। শিক্ষক মানে, যেন-তেন প্রকারের কোনও শিক্ষক ছিলেন না। গ্রামের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি।'

শ্রেয়া থামতেই সেলিম বলে, 'ছিলেন বলছ কেন ! এখন কোথায় তিনি !'

সেলিমের কথা শুনে, খানিকক্ষণ কেন যেন আর কিছু বলতে পারে না শ্রেয়া। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু না, পারে না। কারণ বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে, আঁচলে চোখ মুছে কোনওমতে বলে, 'যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না, আমার বাবা সেখানে গেছেন।'

সেলিম শ্রেয়ার এত কান্না দেখে দ্রুত বলে, 'আমি বুঝতে পারিনি, তোমার বাবা নেই।'

শ্রেয়া ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলে, 'একটা সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়েই তো আমার বাবা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশে, স্বাভাবিকভাবে মরতেও পারেননি।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কেন ! কী হয়েছিল !

শ্রেয়া বলে, 'ইতিহাসে এম.এ. পাশ করার পর কী হল, কে জানে ! বিসিএস দিতে পারতেন, কলেজে যোগ দিতে পারতেন, অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। গ্রামের ছেলে সোজা গ্রামে ফিরে এলেন। স্কুলে যোগ দিলেন। পাশের বাড়ির মেঝ মিয়ার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করলেন। মা ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক পাশ। পরে অবশ্য বাবার অনুপ্রেরণায় বি.এ. পাশও করেছেন। সন্তান বলতে একমাত্র আমি। আমার আর কোনও ভাই-বোন নেই।'

একটানা কথা বলে শ্রেয়া থামে। শ্রেয়াকে থামতে দেখেও কেন যেন সেলিম আর কিছু বলে না।

শ্রেয়া আবার বলে, 'আমার জীবনে আমার বাবাই আমার স্বপ্নের পুরুষ। আদর্শের পুরুষ। শুধু নিজ গ্রাম নয়, আশপাশের গ্রামের মানুষও বড় ভালবাসত। রোগে-শোকে, দুঃখ-কষ্টে ছুটে আসত। হয় অর্থ দিয়ে, নয় বুদ্ধি দিয়ে, নয় শ্রম দিয়ে হলেও সাহায্য করতেন। আমি ভাল মানুষ দেখেছি। আমার বাবার মতো এত ভাল মানুষ আর দেখিনি, জানেন ?'

দু'জনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ায়, বয় এসে সব তুলে নিয়ে যায়। শ্রেয়া আবার বলে, 'ফেরেশতাতুল্য মানুষ একেই বলে কি না, জানি না। আমার এমন পরোপকারী, সৎ মানুষ বাবা এত কষ্ট পেয়ে মরবেন, আমি কখনও ভাবিনি। আমি তখন আর বোধহয় কিশোরী নই। যুবতী। পাশের গ্রামের কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়ি।'

থামে। থেমে মনে হয় খানিক কী ভাবে ! তারপর বলে, 'সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, বাবা ছিলেন ঠিক তাই। যেমন বিশাল হৃদয় ছিল, তেমন দীর্ঘদেহী সুপুরুষও ছিলেন। মা-ও নজর কাড়া সুন্দরী। মা-বাবা দু'জনে অনিন্দ্য সুন্দর হওয়ার কারণে কি না কে জানে, আমিও সামান্য হলেও রূপসী হয়েই জন্মে ছিলাম।'

অন্তহীন খুশির নাগারদোলায় সেলিম তখন যেন কেবল দোল খাচ্ছে ! অনেক খুশিতে শ্রেয়াকে থামিয়ে দিয়ে সেলিম বলে, 'মিথ্যে বললে, শ্রেয়া। ভয়ানক মিথ্যে বললে।'

সেলিমের কথা শুনে হতকচিত শ্রেয়া বলে, 'মিথ্যে বলেছি ! কী মিথ্যে বলেছি !'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, মিথ্যে। ভয়ানক মিথ্যে। তুমি কি সামান্য রূপসী, বলো তুমি ? বলা নেই, কওয়া নেই, আমার মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেল ! তোমার এমন সুন্দর গায়ের রং, পাখির নীড়ের মতো দু'টি চোখ, ফিগার, চেহারা, সব আমাকে পাগল করে দিয়েছে, বুঝেছ ? আর তুমি কি না নিজেকে নিজে অবলীলায়, সামান্য রূপসী বলছ ? এটা মিথ্যে কথা নয়, বলো ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়াও কথার পিঠে পাল্টা মজা করে বলে, 'অবশেষে নিজেই কিন্তু স্বীকার করলেন, মাথাটা আপনার ঠিক নেই। নষ্ট হয়ে গেছে।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম আর কিছু বলে না। কেবল হাসি-হাসি মুখ করে শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শ্রেয়া আবার বলে, 'নজরকাড়া সুন্দরী হওয়ার জন্যে কি না কে জানে,

গ্রামের ভোটচোর, রিলিফ চোর চেয়ারম্যানের ছেলের নজর পড়ল আমার ওপর। নজর না বলে একে বদনজর বলাই ভাল। চেয়ারম্যানের এই কুপুত্রের নাম, খলিল। চারবার পরীক্ষা দিয়ে কোনওমতে টেনেটুনে তৃতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করলেও, উচ্চমাধ্যমিক কিন্তু আর কোনও দিনই পাশ করা হয় না খলিল মিয়ার। এমতাবস্থায় পাঁচবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে, ষষ্ঠবার পরীক্ষার হলে নকল করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন জনাব।'

শ্রেয়া থামে। শ্রেয়াকে থামতে দেখেই সেলিম বলে, 'তারপর ?'

শ্রেয়া আবার বলে, 'তারপর যা হবার তাই নয়। সৎ, নির্ভীক ও অকুতোভয় সুধীর স্যারের হাতে ধরা পড়ার অর্থই হল, বহিষ্কৃত হওয়া। তাই বলে যে সুধীর স্যারকে ছেড়ে দেয়, তাও নয়। চেয়ারম্যানের ছেলে বলে কথা। হোক না ভোটচোর, রিলিফ চোর। একদিন পড়ন্ত বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কে বা কারা, সুধীর স্যারের মাথায় পেছন থেকে এসে লাঠির আঘাত করে। পথের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে লুঠিয়ে পড়েন রক্তাক্ত সুধীর স্যার। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনি জানে বেঁচে যান ঠিকই, কিন্তু জেলা শহরের সরকারি হাসপাতালে কাটিয়ে আসেন মোট সতেরো দিন।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'তারপর।'

শ্রেয়া বলে, 'না। তার কিচ্ছু হয়নি। পুলিশ তদন্ত করে ঠিকই, কিন্তু কেন যেন কারও কিছু হয় না। এর জন্যে অবশ্য সুধীর কাকাও কম দায়ী ছিলেন না।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে বলে, 'কেন ! সুধীর স্যার দায়ী হবেন কেন ! কী বলছ !'

শ্রেয়া এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আমার বাবা ছিলেন সুধীর স্যারের বন্ধু। শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে, বড় ভাব ছিল দু'জনের। আমি তাই সুধীর স্যারকে ক্লাশে স্যার বলতাম, আর বাড়িতে বলতাম কাকা। এত ভাব ছিল দু'জনের যে, কাকা তো একদিন আমার সামনেই বাবাকে বলেই বসলেন, আমরা দুই বন্ধু দুই ধর্মের না হলে, আমি ভায়া তোমার পরীর মতো লক্ষ্মী মেয়েটাকে আমার ডাক্তারি পড়া একমাত্র ছেলের জন্যে, জোর করে হলেও বউ করে তুলে নিয়ে যেতাম।'

একটানা কথা বলে শ্রেয়া থামে।

শ্রেয়াকে থামতে দেখে সেলিম বলে, 'তা কাকার ডাক্তার ছেলের সঙ্গে ইয়ে-টিয়ে ছিল না তো ? সাফ-সাফ বলো ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'ধ্যাৎ, কী যে বলেন ! কাকার ছেলে ঠিক কাকার মতোই ছিল। এত ভাল ছিল যে, মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতই না কখনও। তবে হ্যাঁ, কাকার নিজের জন্যেই কাকা আসলে বিচার পাননি। পেছন থেকে এসে আঘাত করাতে, তিনি আসলে কাউকে দেখেননি ঠিক, তাই বলে পুলিশের কাছে নাম বলতে তো কোনও দোষ ছিল না। তিনি তো ঠিকই জানতেন, কেন আঘাত করেছে, কে করেছে। কাকার সাফ কথা, যা দেখিনি, তা আমি কখনও বলতে পারব না। ব্যস, খলিল মিয়ারও বাড় বেড়ে যায়। আজ এটা অন্যায় করে তো, কাল ওটা করে। আজ এই যুবতী বধূর সম্ভ্রম নষ্ট করে তো, কাল ঐ তরুণীকে ধরে টানাহেঁচড়া করে। শেষমেষ চোখ পড়ে আমার ওপর। একদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে হাট খোলার মোড়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। আমার গায়ে হাত দিতে চায় সে। ব্যস, দ্রুত মাথায় রক্ত উঠে যায় আমার। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পথের আশপাশে দাঁড়ানো অনেক মানুষের সামনেই স্যান্ডেল খুলে পেটালাম। পেটালাম মানে, বেশ পেটালাম ওকে।'

শ্রেয়া একটানা কথা বলে থামে।

শ্রেয়া থামতেই সেলিম দ্রুত বলে, 'তারপর শ্রেয়া ! তারপর কী হল !'

শ্রেয়া বলে, 'বাড়ি ফিরতেই বাবা সব শুনে কেন যেন বড় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমার চিরদিনের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা বাবার মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারলাম, তিনি মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। এরপরই বাড়িতে হঠাৎ ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন পাত্রের জীবনবৃত্তান্ত আর ছবি নিয়ে রোজ সকাল-বিকেল ঘটক আসে আর যায়। বুঝতে পারলাম, বাবা তড়িঘড়ি করে ভাল পাত্র দেখে আমাকে পাত্রস্থ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যে বাবা, আমাকে এম.এ. পাশ না করিয়ে বিয়ে দেবেন না বলতেন, তিনি হঠাৎ এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, বুঝতে বাকি রইল না।'

শ্রেয়া থামে।

সেলিমের যেন তর সয় না। সে দ্রুত বলে, 'তারপর, শ্রেয়া ? তারপর কি হল ? নিশ্চয়ই বিয়ে হয়নি ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া ম্লান হেসে বলে, 'আমি জানি, আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন। বিয়ে হয়ে গেছে আমার।'

সেলিমের মাথায় খান্‌খান্‌ করে আকাশ ভেঙে পড়লেও, সে এতটা হতবাক হত না। হতভম্ব হয়ে সে বলে, 'কী বলছ, শ্রেয়া ! কী বলছ তুমি !'

সেলিমের উৎকণ্ঠা দেখে শ্রেয়া হেসে বলে, 'খুব কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?

আমি জানি, হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার। কিন্তু কী করব বলুন, এটাই যে আমার জীবন। এটাই যে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। হ্যাঁ, এক ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে এক দুপুরে, আমার বড় ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল।'

শ্রেয়া থামে।

শ্রেয়াকে থামতে দেখেই সেলিম বলে, 'তারপর কী হল শ্রেয়া, বলো ?'

সেলিমের কথা শুনেও, খানিক কিছু বলে না। মাথা নিচু করে থাকে। মনে হয় কী যেন ভাবে ! তারপর আবার বলে, 'একই গ্রামের চৌধুরী বাড়ির মেধাবী ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। লাল বেনারসীতে বউ সেজে সেদিনই বাপের ভিটে থেকে স্বামীর বাড়ি চলে গেলাম। মাকে দেখলাম উঠানে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বাবাকে দেখলাম, ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কান্না লুকানোর জন্যে কী ভীষণ চেষ্টা করছেন ! বউ সেজে এলাম। নানা ফুলে-ফুলে বাসরও সাজানো হল। কিন্তু কী অদ্ভুত দেখুন, আমার কিন্তু বাসর করা হল না।'

শ্রেয়া আবার থামে।

বিস্ময়ের যেন সীমা থাকে না সেলিমের। শ্রেয়াকে থামতে দেখেই তাই বলে, 'বিয়ে হল। বাসর সাজানো হল। কিন্তু বাসর হল না। মাথা-মুণ্ডু এসব তুমি কি বলছ শ্রেয়া !'

সেলিমের এত ব্যাকুলতা দেখে, শ্রেয়া এই আবছা আলো–আঁধারের মধ্যেই এক পলক চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে খানিক সেলিমকে দেখে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ। বিয়ে হল। ঘোমটা দিয়ে সেজে সাজানো বাসরে ঢুকলামও, কিন্তু বাসর করা হয়নি আমার।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম দ্রুত বলে, 'তা কী করে সম্ভব ! এ তুমি কী বলছ, শ্রেয়া ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়া বলে, 'শুনুন তাহলে। নতুন বউ সন্ধ্যা নাগাদ শ্বশুর বাড়িতে এসে উঠলাম। হেজ্যাগ লাইটের আলোয় জাঁকজমকের সঙ্গে নববধূকে বরণ করতে, কার্পণ্য করল না বনেদী চৌধুরী বাড়ির মেয়েরা। শাশুড়ী-ননদ তো বউয়ের রূপ দেখে একেবারে আনন্দে আটখানা ! রাতে স্বপ্নের বাসরে সেজেগুজে বসে আছি, স্বামীর প্রতীক্ষায়। ঠিক তখনই খলিল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ফুলে-ফুলে ছাওয়া কাঙ্ক্ষিত বাসর থেকে, হাটখোলার পেছনের এক পরিত্যক্ত গুদাম ঘরে তুলে নিয়ে যায় আমাকে।'

হতভম্ব হয়ে যায় সেলিম ! এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে আর কিছুই বুঝতে পারে না। কোনওমতে কেবল বলে, 'তারপর কী হল, শ্রেয়া !'

শ্রেয়া বলে, 'কী আবার হবে ! রাতভর মানুষের চেহারার কয়েকটা পশু, আমার যুবতী শরীর নিয়ে উৎসব করল। সারারাত ধরে চলল ওদের পাশবিকতা। ওদের জৈবিক ক্ষুধা মিটলে, রাত শেষে ভোরে যখন এক বিধ্বস্ত নারী এসে শ্বশুর বাড়ির উঠানে দাঁড়ালাম, তখন আর আমি চৌধুরী বাড়ির বউ নই। ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম চৌধুরীর নবপরিণীতা স্ত্রী নই। হ্যাঁ, আমার সদ্য বিবাহিত স্বামী তালাক দিলেন আমাকে।'

না, সেলিম আর কিছু বলতে পারে না। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে, শ্রেয়ার বিষণ্ন মুখের দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে।

শ্রেয়া সেলিমকে হঠাৎ এভাবে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে ম্লান হেসে বলে, 'আমার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আরও আছে।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম অস্ফুট বলে, 'আরও আছে ! কি বলছ, শ্রেয়া !'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, অনেক দুঃখেও বোধহয় ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, আছে। এ কেমন জীবন, এ কেমন ভাগ্য আমার, বলুন ? বিয়ের রাতে এক নববধূ কোথায় স্বামীর সোহাগ-ভালবাসা পাবে তা নয়, দেহটা কিছু নরপশুর খোরাক হল। বিয়ের রাতে বাসর তো নয়ই, বরং তালাক পেলাম আমি।'

শ্রেয়া থামে।

শ্রেয়াকে থামতে দেখেই সেলিম বলে, 'থাক, শ্রেয়া। আমি আর শুনতে চাই না।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে দ্রুত বলে, 'শুনতে কষ্ট হচ্ছে আপনার ?'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। এত কষ্ট হচ্ছে যে—'

সেলিমের মুখের কথা মুখেই থাকে। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শ্রেয়া বলে, 'কিন্তু শুনতে যে আপনাকে হবেই। শুরু শুনবেন, মাঝখানেরটা শুনবেন, শেষটা শুনবেন না, তা কী করে হয় ?'

সেলিম এবার বলে, 'ঠিক আছে। বলো তুমি, আমি শুনব।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'শ্বশুরের ভিটে থেকে, আবার বাবার ভিটেয় ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম, বাবা-মা দু'জনে দাওয়ায় বসে আছেন। শুধু মা নয়, বাবাও কাঁদছেন। ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে, বাঁধভাঙা বন্যার মতো কাঁদলাম। দুপুরে মা খেতে ডাকলেন। গেলাম না। সন্ধ্যায় ডাকলেন, রাতে ডাকলেন। কিন্তু গেলাম না। গভীর রাতে মা এবং অন্যদের ভয়ানক চিৎকার-চেঁচামেচিতে উঠানে এসে দেখি, উঠানের কোণে বড় নিম গাছটার ডালে বাবার প্রাণহীন দেহ ঝুলে আছে।'

কথা শেষ করেই ডুকরে কেঁদে ওঠে শ্রেয়া।

শ্রেয়াকে অবোধ শিশুর মতো এভাবে কাঁদতে দেখে, নিজের দু'চোখও জলে ভরে উঠেছে, বুঝতে পারে। তাই দ্রুত বলে সেলিম, 'কেঁদো না, শ্রেয়া। বাবা তো আর কারও চিরদিন বেঁচে থাকেন না।'

শ্রেয়া কাঁদে। ভরা বর্ষার ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে বলে, 'পৃথিবীতে আমার সবচে' প্রিয় মানুষ, বাবার লাশ নামানো হল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাবার লাশের ওপর আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে ভাবলাম, বেঁচে থাকার আর দরকার কী ! বিয়ে হয়েছে। বাসর হয়নি। বরং সম্ভ্রম হারিয়ে ধর্ষিতা হয়েছি। লাল বেনারসিতে তখনও বউ সেজে আছি। কিন্তু তালাক হয়ে গেছে। বিয়ে হলেও স্বামী নেই, ভালবাসা নেই, বাবাও নেই। ভাবলাম, এ কেমন জীবন আমার ! ভাবলাম, বাবার কাছে চলে গেলে কেমন হয় ! এত দুঃখের আর লজ্জার এ জীবন আর টেনে-হিঁচড়ে বেড়ানো সম্ভব নয় ভেবে, গভীর রাতে বাড়ির পেছনের কাঁঠাল গাছে নিজের শাড়ি নিজের গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, তাও হল না। মা দেখে ফেলে চিৎকার করলেন। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এল।'

শ্রেয়া একটানা কথা বলে থামে। খানিক থেমে দু'চোখ মুছে আবার বলে, 'আসলে বাঁচতে চাইনি। বাঁচার একটুও সাধ ছিল না। বুকফাটা আর্তনাদ করে মা বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোর বাবা অভিমান করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। তুইও যদি চলে যেতে যাস, আমি কাকে নিয়ে বাঁচব রে মা ! না। আর মরা হয়নি। বলতে পারেন আমার দুঃখী মা'র মুখের দিকে তাকিয়েই, এই লজ্জার জীবনটা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'শেষ হয়েছে শ্রেয়া তোমার কথা ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া বলে, 'শেষ। বড় লজ্জার, বড় ঘৃণার জীবন আমার, তাই না ?'

কী ভেবে সেলিম বলে, 'হয়তো তাই।'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া দুটো জলে ডোবা চোখ তুলে খানিক অপলক তাকিয়ে বলে, 'বলুন, এমন একটা মেয়েকে কোনও সুস্থ মানুষ ভালবাসতে পারে ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'না, পারে না। তবে অসুস্থ হলে হয়তো পারে।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, চোখে এত জল নিয়েও ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'ভালবাসা শেষ হয়ে গেল তো ? বলেছিলাম না, এ হওয়ার নয়। এ কখনওই হবে না। এ হতে পারে না।'

সেলিম কেমন যেন হাসে ! হেসে বলে, 'শেষ হয়ে গেল নয়। ভালবাসা শুরু হল, শ্রেয়া।'

আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও শ্রেয়া এত খুশি হত কি না, জানে না ! অবাক হয়ে সে তাই বলে, 'কী বলছেন আপনি ! আপনার মাথা ঠিক আছে তো !'

মুচকি হেসে সেলিম বলে, 'তুমিই তো বললে, কোনও সুস্থ মানুষ এসব শোনার পর আর তোমাকে ভালবাসবে না। আমি পাগল, এটা তো আগেই বলেছ। তাই—'

কথা শেষ করতে পারে না সেলিম। মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে, শ্রেয়া বলে, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন, কি বলছেন আপনি !'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, পারছি। জীবনের এতবড় সিদ্ধান্ত, বলা যায় আমার জীবনের সবচে' বড় সিদ্ধান্ত, বুঝতে পারব না কেন ?'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া বলে, 'কিন্তু—'

শ্রেয়ার কথার মধ্যে সেলিম বাধা দেয়। বাধা দিয়ে বলে, 'আমার এ দু'চোখের দিকে চেয়ে দেখ শ্রেয়া। দেখ, আমার এ দু'চোখে তোমার জন্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই।'

শ্রেয়ার ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে। তবু বলে, 'আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি। এ হয় না। এ হতে পারে না। আপনি আগুনে হাত দেবেন না। প্লিজ !'

শ্রেয়ার এত অনুনয়, এত মিনতি করা দেখে, সেলিম হাসে। কিন্তু, কিছু বলে না।

শ্রেয়া আবার একইরকম মিনতি করে বলে, 'কেন আমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে নিজের জীবনটা জড়িয়ে ফেলছেন, বলুন ?'

সেলিম হাসি-হাসি মুখ করে বলে, 'ভালবাসি যে।'

কী ভেবে শ্রেয়া এবার বলে, 'একজন নয়। বেশ ক'জন মিলে আমাকে ন্যাংটো করেছে। বেশ ক'জন মিলে আমাকে নিয়ে রাতভর ফুর্তি করেছে। কেন এত কলঙ্কের সাথে নিজেকে জড়াচ্ছেন, বলুন ! মেয়েদের কলঙ্ক কাজলের কালোর চেয়েও কালো হয়, জানেন না ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম শব্দ করে হাসে। হেসে বলে, 'বেশ হবে কিন্তু। ছোট বেলায় মা আমার দু'চোখে নাকি যত্ন করে কাজল দিতেন। এখন তোমার কলঙ্কের কাজল দু'চোখে মাখব। বেশ হবে।'

শ্রেয়া বলে, 'আপনি কী, বলুন তো !'

সেলিম হেসে বলে, 'আমি সেলিম। তোমাকে ভালবাসা ছাড়া আমার আর বলার মতো কোনও গুণই নেই।'

বয় এসে বিল দিয়ে যায়।

শ্রেয়া বিল পেমেন্ট করে বলে, 'চলুন।'

'চলুন' বলেই, শ্রেয়া উঠে দাঁড়ায়।

সেলিম কিন্তু ওঠে না। সেলিমকে উঠতে না দেখে, শ্রেয়া বলে, 'কী হল আপনার, উঠুন।'

সেলিম মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলে, 'উঠুন নয়, ওঠো বলো ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে হেসে বলে, 'হবে, সব হবে। এবার চলুন তো।'

সেলিম একইরকম ঠায় বসে থাকে। উঠে না। বলে, 'চলুন নয়, চলো হবে।'

শ্রেয়ার কী হয় কে জানে ! বলে, 'চলো।'

সেলিমের মনটা এক অপার খুশির নাগরদোলায় যেন দুলে ওঠে। অনেক হেসে সে এবার বলে, 'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা !'

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কাকরাইলের রাস্তায় তখন অগণিত মানুষজন আর অফুরন্ত গাড়ির ভিড়। রাস্তা জুড়ে দুপুরের গনগনে রোদ।

শ্রেয়া নয়, সেলিমই আবার বলে, 'বললে না, আমাদের আবার কবে দেখা হবে ?'

শ্রেয়া হাত ইশারায় একটা বেবিট্যাক্সি ডাকে। তারপর হেসে বলে, 'জি, না। আর দেখা হবে না।'

সেলিমের চোখ-মুখ জুড়ে থাকা সব আনন্দ দ্রুত কোথায় উবে যায়, কে জানে ! দ্রুত বলে, 'কী বলছ তুমি শ্রেয়া ! কেন দেখা হবে না !'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'কারণ, সামনে একজনের পরীক্ষা। সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম বোকার মতো বলে, 'কার পরীক্ষা ? তোমার ?'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'প্রেমে পড়লে পুরুষ মানুষের মাথার নাট-বল্টু সব ঢিলে হয়ে যায়, সত্যি জানা ছিল না। আরে ধ্যাৎ, আমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে। আমার পরীক্ষা না। পরীক্ষা নিজের, বুঝেছেন ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিমের মুখ-চোখ সব আবার অপরিসীম খুশিতে ভরে যায়। সে হাসে। হেসে বলে, 'ভুল হল, শ্রেয়া। বুঝেছেন নয়, বুঝেছ হবে।'

অনেকদিন পর শ্রেয়ার মনটাও যেন অন্তহীন আনন্দের দোলায় 'নাচ ময়ূরী নাচ' বলে এক ময়ূরীর মতো পাখা মেলে নেচে ওঠে। হাসে। অফুরন্ত খুশিতে খিলখিল করে হেসে সে বলে, 'ভুল হয়েছে। ক্ষমা চাই। এখন থেকে আমৃত্যু, আর আপনি নয়। তুমি বলা হবে, হল ?'

সেলিমও হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, হল। ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ। তাই ক্ষমা করে দিলাম।'

বেবিট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে, আর কথা বলা যায় না। তাই বেবিট্যাক্সিতে উঠে শ্রেয়া হেসে বলে, 'ফার্স্ট না হলে কোনও সম্পর্ক থাকবে না, বুঝেছ ?'

সেলিম হাসে। হেসে শ্রেয়ার কথার উত্তরে কী যেন বলতে চায়। কিন্তু তার আগেই শ্রেয়ার বেবিট্যাক্সি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরীক্ষার আগে আর দু'জনের দেখা হয় না।

সেলিম অবশ্য দেখা করার জন্যে কম চেষ্টা করে না। দু'-একদিন পর-পরই টেলিফোন করে দেখা করার জন্যে বলে। কিন্তু, না। শ্রেয়া কিছুতেই রাজি হয় না। শ্রেয়ার কথা একটাই, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে আর দেখা নয়।

পরীক্ষার শেষ দিন সেলিম পরীক্ষার হল থেকে বেরুতে গিয়ে ভাবে, বাসায় গিয়েই শ্রেয়াকে টেলিফোন করে কাল কোথাও দেখা করার কথা বলবে। শ্রেয়া নিশ্চয়ই আর কোনও ওজর-আপত্তি করবে না। এবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।

কিন্তু হল থেকে বেরিয়েই দেখে হলুদ রঙের চমৎকার মানানসই শাড়ি-ব্লাউজ আর খোঁপায় সুগন্ধি ফুল গুঁজে, শ্রেয়া হাসিমুখে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রেয়াকে দেখে স্বভাবতই মন অপার খুশিতে ভরে যায়। দ্রুত বলে সেলিম, 'আরে শ্রেয়া, তুমি !'

সেলিমের তাকে দেখে অবাক হওয়া দেখে শ্রেয়া হেসে বলে, 'আমাকে দেখে এভাবে চমকে উঠলেন কেন, বলুন তো ? আরে, আমি ভূতও নই, পেত্নীও নই। আমার নাম, শ্রেয়া। কী হল, আমাকে আমার মতো মনে হচ্ছে না আপনার ? অন্য কারও মতো মনে হচ্ছে নাকি ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে হেসে বলে, 'ভুল। আবারও মহা ভুল করেছ তুমি শ্রেয়া।'

সেলিমের এ কথায় অবাক না হয়ে পারে না। অবাক হয়ে বলে শ্রেয়া, 'ভুল ! আমি ভুল করেছি ! কী ভুল !'

সেলিম যথাসাধ্য গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'সাত খণ্ড রামায়ণ পড়ে, এখনও বলছ কি না সীতা কার বাবা !'

সেলিমের কথা শ্রেয়া বুঝতে পারে না। বোঝার কথাও নয়। তাই বলে, 'কী বলছেন আপনি ! আমি কিন্তু আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সেলিম বলে, 'কী কথা ছিল তোমার সঙ্গে ? কথা ছিল, তুমি আমাকে আর কখনও আপনি বলবে না, তুমি বলবে। সে কথা তুমি রেখেছ, বলো ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে।'

সেলিম যথাসম্ভব একইরকম কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলে, 'শুধু ভুল নয়। মহাভুল। তবু ক্ষমার উদারতা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করব না। তাই ক্ষমা করে দিলাম।'

সেলিমের ভারিক্কি চালের কথা শুনে, শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'তা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব, নাকি অন্য কোথাও যাব ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কোথায় যাওয়া যায়, বলো তো ?'

শ্রেয়া বলে, 'অত ভাবাভাবির দরকার নেই। চলো, চন্দ্রিমা উদ্যানে যাই। যেখানে গুণ্ডাদের কাছ থেকে নায়িকাকে বাঁচাতে গিয়ে, নায়ক গুলি খেয়ে একদম চিৎপটাং হয়ে গিয়েছিল।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'তোমার বুদ্ধি আছে। সত্যি বুদ্ধি আছে, শ্রেয়া। চন্দ্রিমা উদ্যানের কথাটা কী করে তোমার মাথায় এল, বলো তো ? হ্যাঁ। চলো, ওখানেই যাব। ওখান থেকেই তো তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে, ক্লিনিকে এনে চিকিৎসা করিয়েছ। বাঁচিয়েছ।'

সেলিমের কথা শুনে দ্রুত সাদা মুখ সিঁদুরের মতো লাল হয়ে যায় শ্রেয়ার। বলে, 'আরে ধ্যাৎ, বুকে জড়িয়ে ধরে বলছ কেন ? বুকে জড়িয়ে ধরেছি নাকি আমি ?'

সেলিম হেসে বলে, 'ঐ হল, এক কথাই হল। জড়িয়ে ধরে এনেছ, আর বুকে জড়িয়ে ধরে ক্লিনিকে এনেছ, একই কথা হল।'

শ্রেয়ার মুখমণ্ডল তখনও লজ্জায় লাল হয়ে আছে। সে আবার বলে, 'কী বলছ তুমি ? আমি জড়িয়ে ধরেছি নাকি তোমাকে ? কে বলেছে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরেছি ?'

শ্রেয়ার এত লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জা পেয়ে চোখ-মুখ সব লাল হয়ে যাওয়া দেখে, সেলিম বেশ মজা পায়। তাই বলে, 'ও, তাই বলো। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরোনি। আমি তো অজ্ঞান হয়েছিলাম। কিছুই দেখতে পাইনি। আমি তো ভেবেছিলাম, জড়িয়ে ধরেছ। আদর করেছ। আরও কত কী করেছ, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।'

ব্যস, লজ্জায় এত লাল হয়ে যায় যে, চোখ তুলে আর তাকাতে পারে না। মাথা নিচু করে, কোনওমতে শ্রেয়া বলে, 'ধ্যাৎ, মুখে কিছুই আটকায় না। মুখে যা আসে তাই বলে বসে।'

সেলিম শ্রেয়ার অবস্থা দেখে এবার বলে, 'হয়েছে, হয়েছে। জড়িয়ে ধরেছ কী ধরোনি, আদর-সোহাগ করেছ কী করোনি, তা নিয়ে তর্ক পরে করলেও চলবে। বলছিলাম, তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকব, নাকি চন্দ্রিমা উদ্যানের দিকে রওনা হব, সেটা আগে বলো ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বারে, তুমিই তো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাজ্যের খোশগল্প আরম্ভ করে দিয়েছ। আমার কী দোষ ? তো চলো, যাই।'

কথা শেষ করে শ্রেয়া আর দাঁড়ায় না। হাঁটতে থাকে।

সেলিমও শ্রেয়ার পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বলে, 'একে কী বলে, জানো শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া বলে, 'কী ?'

সেলিম বলে, 'একে বলে, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমি কোথায় চাতকের মতো তোমার সাথে কখন, কোথায়, কী ভাবে দেখা হবে, তাই নিয়ে মনে-মনে হা-পিত্তেস করছিলাম। আর তুমি কি না চাওয়ার আগেই, এক পশলা বৃষ্টির মতো এসে হাজির।'

শ্রেয়া বলে, 'তুমি খুশি হয়েছ ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে হয়, শ্রেয়া ? তুমি বুঝতে পারছ না, আমি কতটা খুশি হয়েছি ? খুশি মানে, এত খুশি হয়েছি যে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে শাহবাগের মোড়ে এসে একটা বেবিট্যাক্সিতে উঠে বসে। বেবিট্যাক্সিতে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দের মধ্যে দু'জনের কেউ আর কিছু বলে না। চন্দ্রিমা উদ্যানে এসে দু'জনে লেকের কোল ঘেঁষে, একটা দেবদারু গাছের পাশে গিয়ে বসে।

সেলিম নয়, শ্রেয়াই প্রথমে বলে, 'তা তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে, বলো ?'

সেলিম বলে, 'মোটামুটি হয়েছে একরকম।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'মোটামুটি একরকম হয়েছে মানে ! পরীক্ষা ভাল হয়নি তোমার ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে হেসে বলে, 'খারাপ হয়েছে সে কথা বলেছি নাকি আমি ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'না। তা বলোনি। কিন্তু মোটামুটি একরকম হয়েছে, বললে কেন তুমি ?'

সেলিমের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর আনমনে বলে, 'আসলে কী জানো শ্রেয়া, জীবনে সব পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়েছি ঠিকই। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে কেন যেন কখনওই পুরোপুরি তৃপ্তি পাইনি। মনে হয়েছে, আরও ভাল লিখতে পারলেই বোধহয় ভাল হতো।'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া হেসে বলে, 'তৃষ্ণা মেটে না, তাই না ?'

কী ভেবে সেলিম আর এ বিষয়ে কথা বলে না। শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই, সে এবার বলে, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, জানো তো ? তা কী খাবে বলো ? চটপটি, ফুচকা, আইসক্রিম, চা, সিঙ্গাড়া, কী খাবে, জলদি বলো ?'

সেলিমের কথায় শ্রেয়া হেসে বলে, 'বাদাম খাব। চিনেবাদাম।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম ফিক্ করে হেসে বলে, 'বেশ বলেছ কিন্তু। জীবনে কখনও প্রেম না করলেও, প্রেমের সঙ্গে চিনেবাদাম যে বেশ মানানসই খাদ্য, এটা বুঝতে পারছি। মুখোমুখি বসে চুটিয়ে প্রেম করো, আর মনের আনন্দে যত খুশি পারো চিনেবাদাম খাও। ভেরি গুড আইডিয়া।'

সেলিম কথা শেষ করে, দূর থেকে হাতের ইশারায় একটা বাদামওয়ালা ছোকরাকে ডেকে, বড় দুই ঠোঙ্গা বাদাম কেনে।

চন্দ্রিমা উদ্যানের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শেষ বিকেলের মরা রোদ। উদ্যান জুড়ে কেউ একা বসে, কেউ জুটি বেঁধে, কেউ বা বেশ ক'জন মিলে খোশ-গল্পে মশগুল হয়ে আছে। কারও দিকে কারওই যেন খেয়াল নেই।

বাদাম চিবুতে-চিবুতে শ্রেয়া বলে, 'তুমি এটা কী করেছ, বলো তো ?'

সেলিমও বাদাম খায়। খেতে-খেতে বলে, 'কী করেছি ?'

শ্রেয়া বলে, 'দুনিয়ার এত মেয়ে থাকতে, শেষে আমাকেই কি না ভালবাসলে তুমি ? কেন আমাকে এভাবে ভালবাসলে, বলো তো ?'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'দুনিয়ার আর কোনও মেয়েকে আমি ভালবাসি না যে।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'তুমি কী পেয়েছ আমার মধ্যে, বলবে ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে আর নিঃশব্দে নয়, শব্দ করে হেসে সেলিম বলে, 'দুনিয়ার আর কোনও মেয়ের মধ্যে যা পাইনি, তা আমি তোমার মধ্যে পেয়েছি, বুঝেছ ম্যাডাম ?'

শ্রেয়া কেন যেন আবার বলে, 'তা কী পেয়েছ তুমি, বলো শুনি ?'

সেলিম একগাল হেসে বলে, 'ভালবাসা।'

শ্রেয়ার হঠাৎ কী হয় কে জানে ! কেন যেন আর কিছু বলে না। মাথা নিচু করে চুপচাপ দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে।

শ্রেয়াকে হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে দেখে সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, শ্রেয়া। তোমাকে কী বলব, বলো ? তোমার প্রশ্নের উত্তর, আসলে আমার নিজেরও জানা নেই। হ্যাঁ শ্রেয়া, হ্যাঁ। তোমাকে এত ভালবাসি কেন, তা আমি আসলে নিজেও জানি না।'

শ্রেয়া কেন যেন এবার কিছু বলে না। একইরকম দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ বসে থাকে।

শ্রেয়াকে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে সেলিম বলে, 'শ্রেয়া, কী হল তোমার ? কথা বলছ না যে ?'

মাথা তুলে তাকায়। একপলক তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করে বলে, 'বড় ভয় হয় আমার, জানো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'ভয় ! কিসের ভয় শ্রেয়া !'

লেকের শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে আনমনে শ্রেয়া বলে, 'এতদিন কেউ ভালবাসেনি। ভালবাসা কী, তাও বুঝিনি। এখন বড় ভয় হয়, জানো ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'কিসের ভয় ? কেন ভয়, বলবে তো ?'

শ্রেয়া বলে, 'যদি পেয়ে হারাই ? না পাওয়ার যন্ত্রণার চেয়ে, পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা অনেক বেশি, তা তো তুমি জানো। আমার কোনওমতে টেনে-হিঁচড়ে নেয়া ঘৃণার জীবনে, তুমি স্বপ্নের মতো এসে হাসিমুখে ভালবাসার হাত বাড়িয়েছ। ঘুম ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে, তুমি থাকবে তো সেলিম ? হারিয়ে যাবে না তো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হেসে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, হারিয়ে যাব মানে ? আমি কি কচি খোকা যে, পথ ভুলে হারিয়ে যাব ?'

শ্রেয়া দূরে তাকিয়ে থেকে খানিক কী যেন ভাবে! ভেবে বলে, 'বড় লাঞ্ছনার, বড় ঘৃণার জীবন আমার। তুমি স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের মতো ভালবেসে কাছে এসে দাঁড়ালে। এত সুখ, এত ভালবাসা এই অভাগীর কপালে সইবে তো, বলো ? হ্যাঁ, ভয়। বড় ভয় আমার।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি না, বলো তুমি ?'

শ্রেয়া বলে, 'ভালবাস। বড় ভালবাস তুমি আমাকে। ভাল না বেসে যদি ঘৃণা করতে, ভয় ছিল না। এত ভালবাস বলেই তো এত ভয় আমার। যদি হারিয়ে যাও। কখনও যদি হারিয়ে ফেলি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'আমাকে বিশ্বাস করো না তুমি শ্রেয়া, বলো ?'

শ্রেয়ার কী হয় কে জানে ! কেঁদে ফেলে। অশান্ত শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে বলে, 'তোমাকে অবিশ্বাস করব আমি ! তোমাকে অবিশ্বাস করলে, আমার আর থাকে কী বলো ! তুমি শুধু আমার ভালবাসা নও। তুমি আমার জীবন-মরণ। তুমি আমার বেঁচে থাকা– মরে যাওয়া, সব।'

সেলিমের মনটা কানায়-কানায় ভরে যায়। বড় ভাল লাগে সেলিমের। দ্রুত বলে, 'সত্যি বলছ ! সত্যি বলছ তুমি, শ্রেয়া !'

সেলিমের কথা শ্রেয়া শোনে কী না শোনে কে জানে ! যেন ঘোর লেগেছে! ঘোরের মধ্যেই সে আবার বলে, 'তুমিই বলো, আমার জীবনটা ঘৃণার নয় ? লজ্জার নয় ? পথের মধ্যে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত একটা নুড়ি পাথর, যার কোনও মূল্য নেই, দাম নেই, তাকে তুমি বুকে তুলে নিয়েছ ! ভালবেসেছ। পথের পাশের যে পাথরকে মানুষ দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়, তাকে কি না তুমি ঠাঁই দিয়েছ অন্তরে ! তুমি কী, বলো তো !'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'আমি সেলিম। হঠাৎ এমন একটা মেয়েকে ভালবেসেছি, যে শুধু ভয় পায়। ভয় পেয়ে যে চুপচাপ থাকে তাও নয়। কাঁদেও।'

সেলিমের কথা শুনে শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে, অনেক চেষ্টা করে সামান্য হলেও মুখে খানিক হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে শ্রেয়া বলে, 'হঠাৎ এভাবে আমার জীবনে কেন এলে তুমি ? এখন আমার কত ভয়, তুমি জানো না ! এত ভয় নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, বলো তুমি ?'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'না। পারে না।'

শ্রেয়া দুটো জলে ভেজা চোখে দূরে তাকিয়ে থেকে আনমনে বলে, 'তাহলে আমি বাঁচব কেমন করে, বলো ?'

সেলিম হেসে বলে, 'বাঁচার একটাই উপায় আছে। বলব ?'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কী ? বলো।'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'একটাই ওষুধ আছে। ভয় পাবে না। ব্যস, হয়ে গেল। তাছাড়া তুমি এভাবে ভয়-টয় পেয়ে হুট করে মরে গেলে, আমার কী হবে, বলো তো ?'

শ্রেয়া বলে, 'কী হবে ?'

সেলিম হেসে বলে, 'বারে, আমি বিধবা হয়ে যাব না ?'

আর না হেসে পারে না। সেলিমের কথা শুনে, এবার ফিক্ করে হেসে ফেলে। চোখে তখনও অবশ্য জল চিক্‌চিক্ করছে। চোখে জল থাকা সত্ত্বেও, শ্রেয়া খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'ধ্যাৎ, পুরুষ কখনও বিধবা হয় ! পুরুষ মানুষ বিধবা হয়, জন্মেও শুনিনি বাপু।'

শ্রেয়াকে হাসতে দেখে সেলিম এবার বলে, 'একটা কথা বলব, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বলো ?'

সেলিম এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'নিজেকে আর কখনও ছোট ভাববে না তুমি। আমাকে কথা দাও।'

শ্রেয়ার কী হয় কে জানে ! আবার কেঁদে ফেলে। কেঁদে বলে, 'বাসি ফুলে কেউ ফুলদানি সাজায়, বলো ? আমি তো নিজেকে জানি। আমি কী করে, তোমার ঘরে বউ হয়ে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই ?'

সেলিমের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! মাথায় বোধহয় ছলাৎ করে এক চিলতে রক্ত উঠে যায়। রেগে যায়। রেগেমেগে বলে, 'না শ্রেয়া, না। এ কথা তুমি আর কখনও বলবে না আমাকে। কখনও না। এ আমার শেষ কথা।'

অশ্রু ভরা দুটো চোখে তাকিয়ে শ্রেয়া বলে, 'ভুলে যেতে পারি, বলো তুমি ? ইচ্ছে করলেই কি সব ভুলে যাওয়া যায় ?'

সেলিম শ্রেয়ার দুটো জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। ভুলে যাবে। যে করেই হোক ভুলে যাবে তুমি। মনে এত কষ্ট পুষে রেখে কী লাভ, বলো ? তারচে' ভুলে থাকাটাই কি ভাল নয় ?'

দু'টি গণ্ড বেয়ে টপ্‌টপ্ করে মুক্তোর দানার মতো অশ্রু ঝরে পড়ে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে, কোনওমতে বলে, 'কী করে ভুলি, বলো তুমি ? কখনও কি ভুলে যেতে পারি, সেই দুঃখের রাতকে ? সেই অভিশাপের মতো কালো রাতকে ?'

শ্রেয়াকে এভাবে কাঁদতে দেখে, সেলিমের দু'চোখও নিজের অজান্তেই ভিজে ওঠে। কান্নারত শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে, দ্রুত বলে সেলিম, 'কেঁদো না, শ্রেয়া। প্লিজ !'

জলে ডোবা দুটো চোখ তুলে, শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'না। সে রাতটাকে বোধহয় আমি আর কোনওদিন ভুলতে পারব না। কখনও না। কী করে ভুলে যাই! আমার নারী জীবনের সবচে' স্বপ্নের রাত, কাঙ্ক্ষিত রাত, কেমন অভিশপ্ত হয়ে গেল !'

শ্রেয়ার অবিরাম কান্না দেখে সেলিম এবার বলে, 'ভালবেসে আজ এই প্রথম তোমাকে নিয়ে বসেছি। এই দিনটা, এই সময়টা আমার কাছে খুব প্রিয়, শ্রেয়া। তুমি কি আজ শুধু কান্নাকাটিই করবে, বলো ?'

অশ্রুভেজা দু'টি চোখে তাকিয়ে, শ্রেয়া বলে, 'কী করব বলো, কাঁদতে না চাইলেও কেঁদে ফেলি যে। তবে কাঁদলে সামান্য হলেও দুঃখ কমে। একটু হলেও বোধহয় হালকা হই, জানো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'ঠিক আছে, তাহলে আমি যাই। তুমি বসে-বসে কাঁদ, আর দুঃখ কমাও। হালকা হও।'

দু'চোখ মুছে এবার বলে, 'ঠিক আছে। আর কাঁদব না, হল ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম এবার আরও কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

সেলিমকে নিজের গা ঘেষে বসতে দেখে, শ্রেয়া খানিকটা সরে বসে বলে, 'কী হল, এত কাছে যে ? মতলব কী ?'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'বারে, দূরে বসব নাকি ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, অবাক হয়ে বলে, 'তাই বলে এত কাছে বসবে !'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, বসব।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন ?'

সেলিম চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে বলে, 'বারে, তুমি আমার বউ না ? স্বামী বউয়ের পাশে বসবে না ?'

শ্রেয়ার যেন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে বলে, 'কী বলছ তুমি ! আমি তোমার বউ মানে !'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বলেছি। তোমার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তুমি আমার বউ মানে হচ্ছে, আমি তোমার স্বামী।'

শ্রেয়া কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'তার মানে ! আমাদের বিয়ে হয়েছে নাকি !'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'হয়নি। হবে। নিশ্চয়ই হবে। এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে বলে, 'বিয়ে হবে, বুঝলাম। কিন্তু বিয়ে না হতেই বউ বলছ কেন তুমি ?'

সেলিম হেসে বলে, 'বারে, যা পরে বলব, তা আগে বলতে দোষ কী ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'দোষ নেই, না ?'

সেলিম একগাল হেসে বলে, 'না, নেই। কোনও দোষ নেই। যিনি বাবা, তিনি আগেও বাবা, পরেও বাবা।'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া এবার হেসে বলে, 'জি, না। বিয়ের পর বউ হয়। আগে না। তোমার এ উদ্ভট ব্যাকরণ আমার বেলায় চলবে না, বুঝেছ ?'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'বুঝিনে আবার ! বুঝে গেছি, আমার ফাটা কপাল জোড়া লাগতে আরও সময় লাগবে। কোথায় ভাবলাম, এখনই বউ হয়ে গেছ। তা নয়, বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একে কি বলে, জানো ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'কী ?'

সেলিম বলে, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

শ্রেয়ার হঠাৎ আবার কী হয় কে জানে ! বিষণ্ন হয়ে যায় ! বলে, 'এক অভাগীকেই কি না বলছ, এ কথা !'

শ্রেয়ার মন খারাপ করা দেখে, সেলিম বলে, 'ধ্যাৎ ! কথায়-কথায় জীবনের পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করলে হয় ?'

সেলিমের এ কথার উত্তরে, কেন যেন শ্রেয়া আর কিছু বলে না। মাথা নিচু করে উদ্যানের একটা-দুটো করে ঘাস ছেড়ে এবং আনমনে কী যেন ভাবে।

কথায়-কথায় কখন সময় ফুরিয়ে যায়, দু'জনের কেউ টেরও পায় না।

চন্দ্রিমা উদ্যান জুড়ে বিকেল শেষ হয়ে, সন্ধ্যা নামে। নীড়ে ফেরা পাখিরা দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে যায়।

ইচ্ছে হয় না উঠতে। কিন্তু আর তো বসে থাকা যায় না। তাই শ্রেয়া বলে, 'চলো, যাই।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'এখনই না ফিরলে তোমার বাড়িতে কি খুব ভাববে, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বাড়ি মানে তো, শুধু মা আর আমি। মা আমাকে জানেন। তাই স্বাধীনতাও দিয়েছেন প্রচুর। তিনি জানেন, জেনে-শুনে তাঁর শ্রেয়া কোনও অন্যায় কাজ কখনওই করবে না।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'আজ চন্দ্রিমা উদ্যানে এলাম। আজই চলো না যাই, কাকরাইলের সেই চাইনিজে। যেখানে বসে প্রথম আমি তোমাকে আমার ভালবাসার কথা বলেছিলাম।'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া আনমনে বলে, 'যেখানে আমি তোমাকে আমার জীবনের কাজলের চেয়েও কালো কলঙ্কের কথা বলেছি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হাসিমুখে বলে, 'এবং যেখানে ভালবেসে তোমার এত কাজল আমি আমার দু'চোখে মেখেছি।'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া একইরকম উদাস তাকিয়ে বলে, 'তুমি এত ভাল কেন বলো !'

শ্রেয়ার কথা সেলিম শোনে কি না শোনে কে জানে ! দ্রুত বলে, 'তুমি কী বসে থাকবে, নাকি যাবে আমার সঙ্গে ? এমন মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি বাপু ! কথায়-কথায় কেবল পুরনো প্যাচাল !'

কথা বলতে-বলতে সেলিম উঠে দাঁড়ায়। সেলিমকে উঠতে দেখে শ্রেয়াও ওঠে।

দু'জনে আবার একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে, কাকরাইলের চাইনিজের সামনে এসে নামে। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। চাইনিজে ঢুকে দেখে, এখনও লোকজনের তেমন ভিড় নেই।

সেলিম কিছু বলার আগেই, শ্রেয়া আগের দু'দিন বসা সেই একই টেবিলে গিয়ে বসে। সেলিমও মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে।

সেলিম বসতেই শ্রেয়া বলে, 'অর্ডার আমি দেব। বিল আমি দেব। কারও কোনও কথা আমি শুনব না, ব্যস।'

সেলিম হেসে বলে, 'বাপরে, হঠাৎ এত ক্ষেপে গেলে কেন ?'

শ্রেয়া এক মুহূর্ত বোধহয় কী ভাবে ! তারপর বলে, 'আজ আমার জীবনের সবচে' আনন্দের দিন, তাই।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'বারে, শুধু তোমার আনন্দের দিন নাকি ? আমার আনন্দের দিন নয় ?'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'ও তুমি বুঝবে না।'

সেলিম বলে, 'বুঝব না কেন ! তুমি বলো ?'

শ্রেয়া বলে, 'অনেকদিন হল আনন্দ-খুশি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল। তুমি এলে, জীবনে আনন্দ এল। আমার মতো দুঃখী না হলে, আমার মতো কপাল পোড়া না হলে, আমার কথা কারও বোঝার কথা নয়।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই, বয় এসে সামনে দাঁড়ায়।

সেলিম বয়কে দেখেই বলে, 'কে অর্ডার দেবে, বলো ?'

শ্রেয়া বলে, 'আমি।'

'আমি' বলে শ্রেয়া বয়কে খাবারের অর্ডার দেয়। বয় অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

বয় চলে যেতেই, সেলিম বলে, 'পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কেমন হয়েছে, ফিরছি না কেন, সবাই বোধহয় ভাবছেন। সবচে' বেশি কে ভাবছে, বলো তো ?'

শ্রেয়া বলে, 'তোমার মা।'

সেলিম হেসে বলে, 'মা-বাবা তো সন্তানের জন্যে ভাববেনই। তবে বৈশাখী যে আমাকে কত ভালবাসে, তা সে নিজেও জানে না।'

ঠিক এ সময় কোথা থেকে খিলখিল করে হেসে, বৈশাখী এসে দু'জনের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। দু'জনেই একসঙ্গে বৈশাখীকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে !

সেলিম যার-পর-নাই অবাক হয়ে দ্রুত বলে, 'আরে বৈশাখী, তুই ! তুই এখানে !'

বৈশাখী হাসে। খিলখিল করে হেসে বলে, 'জি, আমি। তোমার আদরের একমাত্র ছোট বোন।'

হতবাক হয়ে শ্রেয়া বলে, 'বৈশাখী, তুমি হঠাৎ এখানে !'

বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'জি, না। প্রেম করতে আসিনি। আর আমি কারও মতো এত নজরকাড়া সুন্দরীও নই যে, আমাকে কেউ ভালবাসবে। আমার বান্ধবী সম্পার জন্মদিন। ওর দাওয়াতে এসেছি।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'বেশ করেছ। বান্ধবীর জন্মদিন। আসবে না, তা কী করে হয় ?'

বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'ও হ্যাঁ, যার কাছে অনুমতি নিয়ে বাড়ির বাইরে যাই, তিনি তো বাড়িই ফেরেননি। তিনি তো খুবই ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে, ভাষায় বর্ণনাও করতে পারব না।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বলে, 'এই ফাজিল মেয়ে, তুই যাবি ?'

সেলিমের কথা বৈশাখীর কানে ঢোকে কী না ঢোকে কে জানে ! সে খিলখিল করে হেসে বলে, 'একে কী বলে, জানো শ্রেয়া আপু ! ক্রিকেটের ভাষায় বলি, কট বিহাইন্ড। যাকে বলে, হাতে-নাতে ধরা খাওয়া। ব্যস, কিস্‌সা খতম। ডুবে-ডুবে জল খাওয়ার দিন খতম। আমি মা-বাবাকে সব বলে দেব।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম দ্রুত বলে, 'কী বলছিস বৈশাখী ! তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে নাকি !'

সেলিমের কথা শেষ হতেই বৈশাখী বলে, 'আরে, না। বলব না। দশটা না, পাঁচটা না, আমার একটা মাত্র ভাই। তার এই একটা মাত্র ভালবাসা। না, বলব না। তো যাই, আমার বান্ধবীদের ডেকে নিয়ে আসি। পূর্বরাগ কেমন জমেছে, এসে দেখুক।'

কথা বলে আর দাঁড়ায় না। দৌড়ে গিয়ে একসঙ্গে ছ'জন বান্ধবীকে ডেকে নিয়ে আসে।

মেয়েরা সালাম দেয়। সেলিম ও শ্রেয়া সালামের জবাব দেয়।

বৈশাখী বলে, 'আমার সদা ফার্স্ট হওয়া ভেরি গুড ভাইকে বিনে পয়সায় দেখে, আশা করি তোমরা খুশি হয়েছ। আর ইনি হচ্ছেন, শ্রেয়া আপু। আমার ভাইয়ার সবচে' বড় ইয়ে। তো চলো, যাই।'

সবাই চলে গেলেও, বৈশাখী কিন্তু যায় না। শ্রেয়ার কানের কাছে মুখ এনে, এবার ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'তা ম্যাডাম, আমার সবেধন নীলমণি একমাত্র ভাইয়ার মাথার মগজ-ঘিলু সব চিবিয়ে খাওয়া শেষ হয়েছে, নাকি এখনও কিছু বাকি আছে?'

বৈশাখীর কথা শুনে, শ্রেয়ার চোখ-মুখ সব লাল হয়ে যায়। বলে, 'ধ্যাৎ, তুমি যে কী বলো না, বৈশাখী!'

কথা শেষ করে বৈশাখী যাওয়ার জন্যে দু'পা বাড়িয়েও, আবার শ্রেয়ার কাছে ফিরে আসে। কানের কাছে মুখ নিয়ে, ফিস্‌ফিস্ করে আবার বলে, 'বান্ধবীদের ডেকে আনলাম কেন, বলো তো শ্রেয়া আপু? দেখিয়ে দিলাম, আমার ভাইয়ার পছন্দ কেমন সুন্দর। তাই তো ভাইয়া আমার, একেবারে চিৎপটাং।'

আর দাঁড়ায় না। খিলখিল করে হাসতে-হাসতে চলে যায় বৈশাখী।

শ্রেয়া বলে, 'বৈশাখী সত্যি খুব ভাল মেয়ে।'

সেলিম বলে, 'তুমি বৈশাখীকে ভালবাসবে তো?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বৈশাখীকে ভাল না বেসে কী পারা যায়? ও এমনই একটা মেয়ে, দুনিয়ার সবার কাছ থেকে ভালবেসে ভালবাসা আদায় করে নেবে। জানো, আগে আমাকে কখনও তুমি বলেনি। আজ তুমি বলল। বেশ লাগল।'

বয় স্যুপের বাটি দিয়ে যায়। দু'জন স্যুপ নেয়।

কী ভেবে শ্রেয়া এবার বলে, 'আমরা হঠাৎ গ্রাম থেকে শহরে কী করে এলাম, তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?'

সেলিম বলে, 'বলো, শুনি ?'

শ্রেয়া খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'কোন মুখে আর গ্রামে থাকি, বলো ? আমার ছোট মামার লঞ্চের ব্যবসা। ঠিকেদারি ব্যবসা। ওনার একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল ছিল বাসাবোতে। মা আমাকে নিয়ে ঢাকা এসে ঐ স্কুলে মাস্টারি শুরু করলেন। এখন মা হেডমিস্ট্রেস। ব্যস, সেই থেকে ঢাকাতেই আছি।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, ভেবেছিলাম, আবার বুঝি কেঁদে ফেলবে। যাক, বাঁচা গেল। কান্নাকাটি ছাড়াই কথা শেষ করেছ।'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়া হেসে বলে, 'থাক। আর নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলব না। কাঁদবও না, হল ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'কথা ঠিক থাকবে তো ? আবার কেঁদে ফেলবে না তো ?'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া হাসে।

বয় খাবার দিয়ে যায়। ওরা খায়। খেতে-খেতে কত কী কথা বলে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই !

শ্রেয়া যে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে, তা নয়। কথায়-কথায় এর মধ্যেও দু'-একবার ঠিকই কেঁদে ফেলে সে।

রেজাল্ট আউট হওয়ার আগেই মনের মতো এমন একটা চাকরি পেয়ে যাবে, নিজেও ভাবতে পারেনি সেলিম। ভার্সিটির শিক্ষকতা না, বিসিএস দিয়ে আমলা হওয়া নয়, এমন একটা চাকরির কথাই যেন অনেকদিন ধরে মনে-মনে ভাবছিল সে।

এনজিওর চাকরি। একসঙ্গে চাকরি করা যেমন হবে, মানুষের সেবা করার ইচ্ছে থাকলে তাও করা যাবে। বেতনও ভাল। প্রথমেই সর্বমোট মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। এছাড়াও গাড়ি আছে। কোয়ার্টার আছে।

প্রথম তিন মাস ট্রেনিং। ট্রেনিং অবশ্য ঢাকাতেই। তারপর ঢাকার বাইরে কোথাও পোস্টিং হবে।

ওদের লোক নেয়ার কথা তিনজন। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার জন্যে রেজাল্ট বাছাই করে, প্রায় হাজার খানেকের মতো লোককে ডেকেছিল। মাস দেড়েক আগে ইন্টারভিউ দিয়ে, ইন্টারভিউয়ের কথা প্রায় ভুলেই গেছে। ভেবেছে, হবে না। মনে রেখে কী লাভ !

কিন্তু সকাল বেলা কুরিয়ার সার্ভিসের পিয়ন এসে নিয়োগপত্রটা দিয়ে গেলে, চমকে ওঠা নয়, ভীষণ চমকে ওঠে সে !

মা মরিয়ম বেগম নয়, বাবা আফজাল হোসেনও নয়, নিয়োগপত্রটা নিয়ে প্রথমেই কেন যেন সেলিম ছুটে যায় বৈশাখীর ঘরের দিকে।

'বৈশাখী, ও বৈশাখী শোন ! সুখবর ! বড় সুখবর !'

হন্তদন্ত হয়ে সেলিমকে এভাবে তার ঘরের দিকে আসতে দেখে, অবাক হয়ে যায় বৈশাখী। না, সেলিমের এ চেহারা আর আগে কখনও দেখেনি সে। কী হয় কে জানে ! সারাদিন বকবক করা মুখরা বৈশাখীও কেন যেন কিছু বলতে পারে না। নিষ্পলক বৈশাখী কেবল চেয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ।

বৈশাখী কিছু বলছে না দেখে, সেলিম যে চুপ করে থাকে তা নয়। সে বলে, 'সুখবর। বড় সুখবর রে বৈশাখী।'

আর চুপ করে থাকতে পারে না। বৈশাখী এবার বলে, 'কী সুখবর, ভাইয়া ! সেটা বলবে তো !'

সেলিম দ্রুত বলে, 'চাকরি, বুঝেছিস ? খুব ভাল একটা চাকরি হয়ে গেছে আমার।'

অন্তহীন খুশিতে যেন ঝলমল করে ওঠে বৈশাখী ! দ্রুত বলে, 'কী বলছ তুমি, ভাইয়া ! সত্যি বলছ তো ! চাকরি হয়ে গেছে তোমার ! আমার তো এত খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে, জানো !'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম আবার বলে, 'বেতনও খুব ভাল, জানিস ? মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো।'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'শ্রেয়া আপুকে বলেছ ?'

সেলিম বলে, 'না।'

বৈশাখী এবার বলে, 'বাবা-মাকে বলেছ ?'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বলে, 'সময় পেলাম কোথায় ? এইমাত্র তো চিঠিটা পেয়েছি। ব্যস, পড়েই পড়ি কী মরি করে, তোকে সবার আগে ছুটে এসেছি খবরটা দিতে।'

সেলিমের কথা শুনে, বুকটা যেন ভরে যায়। আনন্দে আটখানা হয়ে, বৈশাখী বলে, 'ব্যস, আর বলতে হবে না। এ পৃথিবীতে তুমি কাকে বেশি ভালবাস, তা আমি বেশ বুঝে গেছি। বলতে আর দ্বিধা নেই, তুমি বোধহয় শ্রেয়া আপুর চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাস। তবে আগামীতে শ্রেয়া আপু, না আমাকে বেশি ভালবাসবে, তা নিয়ে অবশ্য এখনও আমার বেশ সন্দেহ আছে।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বলে, 'আরে ধ্যাৎ, এর মধ্যে আবার নিরীহ মেয়েটাকে টেনে আনছিস কেন, বলতো ?'

সেলিম বোধহয় মুখের কথা শেষও করতে পারে না। বৈশাখী বলে, 'নিরীহ, তাই না ? হ্যাঁ, তোমার মতো এক মেধাবী ছেলের উর্বর মস্তিষ্ক যিনি চিবিয়ে খেয়েছেন, তিনি তো নিরীহই হবেন !'

বৈশাখীর খোঁচা গায়ে মাখে না। বরং অনেকদিন পর বৈশাখীর একটা হাত ধরে আবেগে বলে, 'আমার চাকরি হয়েছে। তুই খুশি হয়েছিস তো, বৈশাখী ?'

বড় হয়েছে বলে, কতদিন সেলিম তার হাত ধরেনি। কী হয় কে জানে, ইচ্ছে করেই বৈশাখী হাত ছাড়িয়ে নেয় না। বরং ভাইয়ের পাশে গিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, 'আরে, তুমি প্রশ্ন করে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও নাকি ভাইয়া ! ভাইয়ের সাফল্যে বোন খুশি হবে না তো, কী হবে বলো ! তা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না মা-বাবাকেও খবরটা দেবে ?'

বৈশাখীর কথা শুনে যেন হুঁশ হয়। দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, তাই তো রে বৈশাখী! চল, যাই। বাবা-মাকে বলি।'

দু'জনে বাবা-মা'র ঘরে এসে দেখে, আফজাল হোসেন তখন অফিসে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

বৈশাখী এবং সেলিম দু'জনকে একসঙ্গে আসতে দেখে, আফজাল হোসেন কিছু বলার আগেই মরিয়ম বেগম বলেন, 'কী ব্যাপার ? আজ কার মুখ দেখে, বুড়োবুড়ি দু'জনে ঘুম থেকে উঠেছি ? সাত সকালে পুত্র-কন্যা দু'টিতেই হাসিমুখ করে, পিতা-মাতার ঘরে এসে হাজির হয়েছিস ? তা কী মতলব, বল তো ?'

সেলিম মা'র কথার উত্তরে, কিছু বলবে বলে বোধহয় মুখ খুলেছিল। কিন্তু বৈশাখী তার আগেই বলে, 'হ্যাঁ, মা। আমিও তো সে কথাই জানতে চাচ্ছি, তোমার কাছে। আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছ, বলো তো ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'কার আবার ? প্রতিদিন যার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠি, তাঁর। তোর বাবার।'

বৈশাখী হাসে। হেসে বলে, 'প্রতিদিনের মতো আজকের দিনটা কিন্তু নয় মা। আজকের দিনটা অন্য রকমের। হ্যাঁ, একেবারে অন্য রকমের।'

বৈশাখীর কথা শুনে মরিয়ম বেগম কিছু বলার আগেই, এবার আফজাল হোসেন বলেন, 'এত প্যাচাল পাড়ছিস কেন ? কী হয়েছে, বলবি তো ?'

আফজাল হোসেনের কথা শুনে, চুপ করে যাওয়ার কথা। কারণ, বাবার মুখের ওপর কখনও কথা বলে না। কিন্তু আজ আর চুপ করে থাকে না বৈশাখী। হাসিমুখে বলে, 'বুঝেছ বাবা, ভাইয়া কেল্লাফতে করে ফেলেছে।'

বৈশাখীর কথা শুনে আফজাল হোসেন দ্রুত বলেন, 'তার মানে ! কী করেছে তোর ভাইয়া !'

এতক্ষণ বৈশাখীর জন্যে কথা বলতে পারছিল না। এবার দ্রুত বলে সেলিম, 'আমার একটা চাকরি হয়েছে বাবা।'

সেলিম তার হাতে ধরা নিয়োগপত্রের খামটা, আফজাল হোসেনের দিকে বাড়িয়ে ধরবে বলে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু মরিয়ম বেগম ছোঁ মেরে নিয়ে, দ্রুত স্বামীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো রে, বৈশাখী। আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি, বল তো ?'

বৈশাখী হেসে বলে, 'কার আবার ? বাবার।'

নিয়োগপত্রে চোখ রেখেই, চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে আফজাল হোসেন বলেন, 'বাহ, বেশ ভাল চাকরি তো রে বাবা ! এত ভাল চাকরি পেয়েছিস ! আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

বাবার হাসি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে সেলিম হেসে বলে, 'ভাল চাকরি পাব না তো কী ? আমি তোমার ভাল ছেলে নই বাবা, বলো ?'

ছেলের কথা শুনে, মরিয়ম বেগম দ্রুত ছুটে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুই ভাল ছেলে না হলে, ভাল ছেলে কে, বল তো ? তুই শুধু ভাল না, খুব ভাল ছেলে বাবা। হ্যাঁ বাবা, তুই আমাদের সাত রাজার ধন।'

মরিয়ম বেগমের কথা বোধহয় শেষও হয় না, বৈশাখী দ্রুত বলে, 'ভাইয়াই যদি তোমাদের সব হয়, তাহলে আমি কী মা ? আরে, আমার কথা কিছু বলছ না কেন তুমি ? আমি কি তোমাদের কেউ না ?'

মেয়ের কথা শুনে, মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তুই কী, তুই শুনবি ?'

বৈশাখী হেসে বলে, 'হ্যাঁ, বলো ? শুনব না কেন ? অবশ্যই শুনব ।'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তুই হচ্ছিস আমাদের টেপরেকর্ডার।'

মা'র কথা শুনে, বৈশাখী দ্রুত বলে, 'আরে, কী বলছ তুমি মা ! টেপরেকর্ডার মানে !'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'যেভাবে সারাদিন বকবক করে চলেছিস, মনে হয় মুখে যেন খই ফুটছে তোর। টেপরেকর্ডার না বলে, কী বলি, বল ?'

আফজাল হোসেনের যেন কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নিয়োগপত্রটা তিনি তখনও পড়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে কতবার যে পড়ে ফেলেছেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই ! নিয়োগপত্রে চোখ রেখেই, তিনি এবার বলেন, 'আল্লাহ বোধহয় এতদিনে সত্যি আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, সেলিমের মা। এত ভাল একটা চাকরি পেয়েছে সেলিম। আমি ভাবতেই পারছি না।'

আফজাল হোসেনের কথা শেষ হতেই মরিয়ম বেগম ছেলের মাথায়, চুলে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহকে আমিও শোকর গুজর করছি। কিন্তু আমাদের সেলিমের মতো ছেলে, আর ক'জন মা-বাপের ভাগ্যে জোটে, বলো ?'

মরিয়ম বেগম থামতেই, আর অপেক্ষা করে না বৈশাখী। দ্রুত বলে, 'আরে, আমার কথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন মা, বলো তো ? আমার মতো এমন একটা ভাল মেয়ে, তুমি আর কোথাও দেখছ, বলো ?'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর কথার পিঠে কিছু বলবেন বলে বোধহয় মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু তার আগেই সেলিম বলে, 'তুমি ভুল বলেছ মা।'

সেলিমের কথা শুনে, মরিয়ম বেগম স্বভাবতই অবাক হন। অবাক হয়ে বলেন, 'আমি ভুল বলেছি ! কি বলছিস তুই বাবা !'

সেলিম মা'র কথা শেষ হতেই হেসে বলে, 'হ্যাঁ, মা। ভুল। শুধু সন্তানের কথা বলবে। তোমাদের কথা বলবে না। তা হলে কী করে হবে মা ? তোমাদের মতো মা-বাবাই বা ক'জনের ভাগ্যে ছোটে, বলো তুমি ?'

ছেলের কথা শুনে মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'দুনিয়ার সব মা-বাবাই একরকম হয় বাবা। পৃথিবীর সব মা-বাবাই তাদের সন্তানদের একরকম ভালবাসেন, বুঝেছিস ?'

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই, বৈশাখী আবার বলে, 'না, মা। তোমরা কিন্তু দুনিয়ার সব মা-বাবার মতো, ভাইয়া আর আমাকে সমান চোখে দেখ না। আরে, একদিকে ভাইয়াকে নিয়ে তোমাদের গর্বের শেষ নেই, আর অন্যদিকে আমাকে কি না বলছ, তুচ্ছ একটা যন্ত্র, টেপরেকর্ডার !'

আফজাল হোসেন এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনিও হাসি-হাসি মুখ করে বলেন, 'তা তোর ভাইকে নিয়ে তোর কোনও গর্ব নেই ?'

এ বাড়িতে শুধু ভয় পায় একজনকে। সে বাবা। বাবাকে এত হাসি-হাসি মুখ করে কথা বলতে খুব কমই দেখেছে বৈশাখী। তাই বাবার কথার পিঠে কথা বলতে, আজ আর ভয় পায় না। দ্রুত বলে, 'গর্ব মানে ! এত গর্ব, এত অহংকার আমার, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না বাবা। মা বলেছেন, সাত রাজার ধন। ভাইয়া আমাদের সত্যি সাত রাজার ধন, বাবা।'

বৈশাখী কথা শেষ হতেই, আফজাল হোসেন এবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আজ রাতে বাড়িতে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে হয় না ? সেলিম সরিষা ইলিশ পছন্দ করে। টাকা দাও। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে, একটা বড়সড় ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসব।'

আফজাল হোসেনের কথা শেষ হতে না হতেই, বৈশাখী বলে, 'আর আমি পছন্দ করি পোলাও, সঙ্গে গরুর মাংসের ভুনা।'

বৈশাখীর কথা শুনে, বদ্ধ আফজাল হোসেন আজ স্বভাববিরুদ্ধ শব্দ করে খানিক হাসেন। একগাল হেসে তিনি বলেন, 'তুই চাকরি পেয়েছিস নাকি ? তোর পছন্দ-অপছন্দ জানতে চেয়েছে নাকি কেউ ?'

আফজাল হোসেনের কথায় বৈশাখী হেসে বলে, 'না। কেউ অবশ্য আমার কাছে জিজ্ঞেস করেনি। তবু ভাবলাম, এ বাড়িতে আজ সবচে' খুশির দিন, চটপট আমার পছন্দের মেন্যুও বলে রাখি।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই সেলিম এবার বলে, 'আমি বলি কী বাবা, আজ আমার পছন্দে না। আজ বৈশাখীর আর তোমার পছন্দে এ বাড়িতে রান্না হবে। তুমি গলদা চিংড়ি পছন্দ কর। গলদা চিংড়িও আনা হবে। বাজার কবর আমি নিজে। আমার টিউশানির টাকা দিয়ে।'

আফজাল হোসেন কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই মরিয়ম বেগম বলেন, 'কেন ? তুই হঠাৎ বাজারে যাবি কেন ? তোর বাবা—'

না, মরিয়ম বেগমকে কথা শেষ করতে দেয় না সেলিম। মুখ থেকে কথা

কেড়ে নিয়ে সে এবার দ্রুত বলে, 'মা, আমি জানি বাবার সর্বসাকুল্যে বারো হাজার টাকা মাইনে। বাড়ি ভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, তার ওপর আমাদের দু' ভাই-বোনের পড়াশোনার খরচ তো আছেই। কত কষ্ট করে তুমি আর বাবা মিলে আমাদের এতবড় করেছ, তা আমি জানি। এবার তোমাদের সুখের দিন মা। ছেলে-মেয়ের জন্যে অনেক কষ্টই তো করলে। এবার আমাদেরও কিছু করতে দাও মা।'

মরিয়ম বেগমের দু'চোখ দ্রুত জলে ভরে ওঠে। তিনি ছেলের বুকে, পিঠে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে যদি তোর মতো একটা করে ছেলে থাকত, কোনও মা-বাবারই অন্তরে আর কোনও দুঃখ থাকত না বাবা।'

আনন্দঘন পরিবেশ আবার হঠাৎ ভারী হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে, সব সময় হাসি-খুশি থাকা বৈশাখী দ্রুত বলে, 'সরিষা ইলিশও কিন্তু হবে মা। ভাইয়ার বিজয়ের এই উৎসব। অথচ ভাইয়ার পছন্দের মেন্যু থাকবে না, তা কী করে হয়? তুমি তোমার পছন্দের একটা খাবারের কথা বলো না মা? ভাইয়া বাজার থেকে কিনে আনবে।'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর কথা শুনে হেসে বলেন, 'দূর বোকা, আমার আবার পছন্দ কী রে! তোদের পছন্দই তো সারাজীবন ধরে আমার পছন্দ।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেলিম বলে, 'সারাজীবন কেবল আমাদের কথাই তুমি ভেবে গেলে মা। নিজের কথা কিন্তু কখনওই ভাবলে না।'

মরিয়ম বেগম হাসেন। হেসে বলেন, 'বারে, তোদের আনন্দই তো আমার আনন্দ। তোদের সুখই তো আমার সুখ বাবা।'

মা'র কথা শুনে সেলিম দ্রুত বলে, 'নিজের সুখ, নিজের পছন্দ অপছন্দ বলেও তো একটা কথা আছে মা। নিজের পছন্দ-অপছন্দ বলে কি কিছুই থাকতে নেই! এ তুমি কেমন মা!'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'কেমন আবার? দুনিয়ার সব মা যেমন হয়, তেমন।'

মা'র কথা শুনে সেলিম খুশি হতে পারে না। বলে, 'ধ্যাৎ মা, তুমি সত্যি এ কেমন, বলো তো? সাধ-আহ্লাদ নেই। জীবনে কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই। আমাদের সুখই তোমার সুখ। না, মা। এ আমি সত্যি মানতে পারছি না।'

সেলিমের কথা শেষ হতেই, আফজাল হোসেন এবার বলেন, 'আমি তাহলে এখন অফিসে চললাম, সেলিমের মা। আমার অফিসের আবার দেরি হয়ে গেল।'

কথা বলে যে আর দাঁড়িয়ে থাকেন আফজাল হোসেন, তা নয়। অফিসে যাবেন বলে হন্তদন্ত হয়ে চলে যান। যাবার সময় নিয়োগপত্রটা সেলিমের হাতে না দিয়ে, নিজের পকেটে পুরে বলেন, 'এটা অফিসের সবাইকে দেখাব বলে নিয়ে যাচ্ছি বাবা, কেমন ?'

সেলিম হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ব্যস, আর পেছন ফেরেন না।

আফজাল হোসেন চলে যেতেই, মরিয়ম বেগম ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুই কি এখন কোথাও যাবি বাবা ?'

সেলিম কিছু বলার আগেই, বৈশাখী মুচকি হেসে বলে, 'না, মা। এখন যাবে না। আমার মনে হয়, বিকেলে যাবে। কোথায় যাবে, তাও বলি। চন্দ্রিমা উদ্যান।'

বৈশাখীর কথা শুনে মরিয়ম বেগম বলেন, 'চন্দ্রিমা উদ্যানে কি তোর কোনও কাজ আছে বাবা ?'

মা'র কথা শুনে বৈশাখী একইরকম হেসে বলে, 'কী বলছ মা ? কাজ মানে, এত কাজ আছে যে, তোমাকে বলে শেষ করতে পারবে না ভাইয়া।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই, সেলিম বৈশাখীর দিকে কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'তুই থামবি কি না, বলতো বৈশাখী ? ননস্টপ বকবক করে চলেছিস্, তো চলেছিস্ ! প্লিজ, এবার থাম তো।'

বৈশাখী হেসে বলে, 'ঠিক আছে। আমি থামলাম এবং চললাম।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ায় না। কৃত্রিম অভিমানে গাল ফুলিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। বৈশাখী চলে যেতেই, সেলিম এবার বলে, 'আমি ঠিক চারটার সময় একটু বাইরে যাব মা। সন্ধ্যার মধ্যেই বাজার নিয়ে ফিরে আসব।'

মরিয়ম বেগম বলেন, 'ঠিক আছে, বাবা। তুই বাজার নিয়ে এলে, আমি নিজ হাতে তোদের জন্য রান্না করব।'

মা'র কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'পাগলীটা পোলাও পছন্দ করে। আমি পোলাওর চাল কিনে নিয়ে আসব। আজ পোলাও রেঁধো মা, কেমন ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তুই বৈশাখীকে খুব ভালবাসিস, তাই না বাবা ?'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে সব শুনছিল। নিজের ঘরে যায়নি। ঝড়ের মতো আবার মা ও ভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, 'না, মা। ভাইয়া আমাকে আগের মতো আর ভালবাসে না।'

মরিয়ম বেগম হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলেন, 'তোরা ভাই-বোন কে কাকে কতটা ভালবাসিস, ফয়সালা কর। আমি রান্নাঘরে চললাম।'

মরিয়ম বেগম চলে যেতেই বৈশাখী বলে, 'না। তুমি আমাকে আর কোনও হিসেবে আগের মতো ভালবাসতেই পারো না।'

সেলিম বৈশাখীর কথা শুনে মজা পায়। বলে, 'এই হিসেব মতো ভালবাসা কী রে ? এটা অঙ্ক নাকি ? হিসেব মতো ভালবাসা বলছিস ?'

বৈশাখী একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর হেসে বলে, 'তুমি আগে আমাকে শতকরা হিসেবে, একশ' ভাগ ভালবাসতে। ঠিক কি না, বলো ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'আগে ভালবাসতাম বলছিস কেন ! এখন ভালবাসি না আমি !'

বৈশাখী সেলিমের কথা শুনে বলে, ' হ্যাঁ, ভালবাস।'

সেলিম বলে, 'তাহলে এসব কী বলছিস তুই ?'

বৈশাখী মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'এখন একজন এসে ভাগ বসিয়েছে। ব্যস, আধাআধি। মানে, আমার ভাগে পঞ্চাশ ভাগ হয়ে গেল।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম বেশ মজা পায়। হাসে। কিন্তু কিছু বলে না।

কী ভেবে এবার আর জোরে নয়, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, 'সেই সৌভাগ্যবতীর নাম কি আমি বলব, ভাইয়া ?'

সেলিম আর হাসে না। এবার কটমট করে তাকিয়ে বলে, 'এই, তুই থামবি ? নাকি মারব এক চড়।'

সেলিমের এই কৃত্রিম কটমট করে তাকানো এবং ধমক দেয়া দেখেও, বৈশাখী কিন্তু থামে না। একইরকম বলে, 'তবে হ্যাঁ, একটা কথা স্বীকার না করলে কিন্তু বড় অন্যায় করা হবে। ভালবাসে। হ্যাঁ, চাঁদের মুখের মতো সুন্দর মুখের মেয়েটা, বড় ভালবাসে আমাকে।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম হেসে বলে, 'এই, মেয়েটা কী রে ! এভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলছিস কেন, বল তো ? শ্রদ্ধা-ভক্তি সব কিছু একেবারে অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেছে, না ?'

সেলিমের কথা বোধহয় শেষও হয় না, মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে বৈশাখী বলে, 'বুঝেছি। মেয়েটা নয়। ভাবীটা বলতে হবে।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতে না হতেই 'পাজী, নচ্ছার মেয়ে কোথাকার' বলে বৈশাখীর কান ধরার জন্যে হাত বাড়ায় সেলিম। কিন্তু বৈশাখী খিলখিল করে হেসে ছুটে পালায়।

বৈশাখী ছুটে পালিয়ে গেলেও, সেলিম দাঁড়িয়ে থেকে নিজে নিজেই অনেকক্ষণ হাসে।

সেলিম যখন চন্দ্রিমা উদ্যানে এসে পৌঁছে, তখন সাড়ে চারটা বেজে গেছে। সব সময় যে দেবদারু গাছটার কাছে বসে, সেখানে এসে দেখে শ্রেয়া অনেক আগেই এসে বসে আছে।

শ্রেয়া তাকে দেখেই মুচকি হাসে। হেসে বলে, 'কেমন আছ ?'

সেলিম প্রতিদিনের মতো মুখোমুখি বসে। বসে বলে, 'ভাল আছি। খুব ভাল আছি।'

শ্রেয়া একইরকম হাসে। হেসে বলে, 'ভাল। হ্যাঁ, ভাল থাকলেই ভাল।'

সেলিমও হাসে। হেসে বলে, 'জি, না। শুধু ভাল নই। আমি খুব ভাল আছি বলেছি। তা কেন খুব ভাল বললাম, জিজ্ঞেস করলে না ?'

শ্রেয়া মুচকি হেসে বলে, 'জিজ্ঞেস করার কোনও দরকার নেই। আমি জানি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম অবাক না হয়ে পারে না। অবাক হয়ে তাই বলে, 'তুমি জানো, আমি কেন খুব ভাল আছি বলেছি !'

শ্রেয়া ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলে, 'হ্যাঁ, জানি।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'তো বলো ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'তোমার খুব ভাল একটা চাকরি হয়েছে। বেতন মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো।'

সেলিম এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না। তাই দ্রুত বলে, 'ফুল টাইম গাড়ি আছে, তা জানো ?'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'বাড়িও আছে।'

সেলিম যেন সত্যি আকাশ থেকে পড়ে ! যার-পর-নাই অবাক হয়ে তাই বলে, 'আরে, তুমি হুবহু সব জানলে কেমন করে, বলো তো ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শ্রেয়া সেলিমের এত অবাক হওয়া দেখে মুচকি হাসে। কিন্তু কিছু বলে না।

সেলিমের অবাক হওয়ার যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। সে আবার বলে, 'এই, তুমি ঠিক-ঠিক সব জানলে কেমন করে, বলো তো শ্রেয়া !'

শ্রেয়া একইরকম মুচকি হেসে বলে, 'ম্যাজিক, বুঝলে ? ম্যাজিক জানি তো।'

শ্রেয়ার কথায় সেলিম আরও অবাক হয় ! অবাক হয়ে বলে, 'ধ্যাৎ, ম্যাজিক জানো নাকি তুমি !'

হাসে। সেলিমের অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে, হেসে শ্রেয়া এবার বলে, 'জি, হ্যাঁ। ম্যাজিক জানি। আর আমার এই ম্যাজিকের নাম বৈশাখী।'

ব্যস, বৈশাখী যে আগে-ভাগে সব বলে দিয়েছে, এবার বুঝতে পারে। তাই সেলিম হেসে বলে, 'বৈশাখী টেলিফোনে তোমাকে সব বলে দিয়েছে, না ? মেয়েটা যে কী ! পেটে কোনও কথা থাকে না।'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'বারে, বলবে না কেন ? বলেছে, বেশ করেছে। এত বড় একটা সুখবর বলবে না ইবা কেন ?'

সেলিমও হাসে। হেসে বলে, 'তবু বলছিলাম কী, আমার নিজ মুখে বলার আনন্দটা একদম মাটি হয়ে গেল না, বলো ?'

সেলিমের কথা শেষ হলেও, কথার পিঠে কেন যেন শ্রেয়া এবার কিছু বলে না। খানিক কী যেন ভাবে ! শ্রেয়াকে চুপচাপ হয়ে হঠাৎ কী ভাবতে দেখে, সেলিম বলে, 'কী হল ! চুপচাপ হয়ে গেলে যে ! কী ভাবছ !'

মাথা নিচু করে নিজের অজান্তেই, চন্দ্রিমা উদ্যানের একটা দুটো করে ঘাস ছেঁড়ে শ্রেয়া। তারপর মাথা নিচু করেই আনমনে বলে, 'এত আনন্দে আজ কী করেছি, জানো ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'কী করেছ ?'

শ্রেয়া বলে, 'কেঁদেছি। সারাদিন ধরে কেঁদেছি।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম হতবাক হয়ে যায়। দ্রুত বলে, 'আরে, কী বলছ তুমি, বলো তো ! আমি চাকরি পেয়েছি। তুমি কোথায় ফুর্তি করবে, তা নয়, তুমি কি না কেঁদেছ !'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, কেঁদেছি। অনেক কেঁদেছি। কেঁদে বুক ভাসিয়েছিও বলতে পারো।'

সেলিম শ্রেয়ার কথায় অবাক হয়ে বলে, 'এই জন্যেই বলে, দেবতারাও মেয়েদের মন বুঝতে পারেনি। আমি তো কোন ছার ! তা কাঁদলে বুঝলাম। কাঁদলে কেন, তা কিন্তু বুঝলাম না। সেই কাঁদার প্রকৃত কারণটা কী, একটু বুঝিয়ে বলবে ম্যাডাম ?'

মাথা নিচু করে শ্রেয়া বলে, 'আসলে টেলিফোনে বৈশাখীই আগে কেঁদে ফেলেছে।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'আরে বাপরে, আমার তো বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে। বৈশাখীও কেঁদেছে ! কী আশ্চর্য, ওকে তো এ জীবনে আমার এই দুই চর্মচক্ষে, কখনও কাঁদতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার। বাপরে বাপ, শুনে তো মাথার মধ্যে সত্যি চরকির মতো বন্‌বন্ করে চক্কর দিচ্ছে। তা আর কৌতূহল না বাড়িয়ে বলো না শ্রেয়া, হঠাৎ করে তোমাদের দ্বৈত কান্নাকাটির হেতুটা কী !'

সেলিমের কথা শুনে শ্রেয়া মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে বলে, 'বৈশাখী টেলিফোনে চাকরির সুখবরটা দিয়ে বলল, অনেক কষ্ট করে আমরা এত বড় হয়েছি, জানেন আপু ? বাবা একটা বেসরকারী ফার্মে চাকরি করেন। বেতন অল্প। এই ভাইয়াই আমাদের পুরো পরিবারের স্বপ্ন, ভালবাসা, সব। আজ কী খুশি যে লাগছে, আপনাকে যে কী বলব, শ্রেয়া আপু ! ব্যস, বলেই টেলিফোনে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল বৈশাখী। আমারও যে দু'টি পোড়া চোখে কী হল কে জানে ! বুঝতে পারলাম, কেঁদে ফেলেছি, দু'চোখ বেয়ে টপ্‌টপ্ করে অশ্রু ঝরে পড়ছে।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতে না হতেই, সেলিম দ্রুত বলে, 'আরে, কোথায় আমার ভাল একটা চাকরি হওয়ায় তোমরা আনন্দ করবে, তা নয় কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছ। আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না, শ্রেয়া।

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'এ দুঃখের অশ্রু নয়। এ অশ্রু আনন্দের। বড় আনন্দের সেলিম।'

শ্রেয়ার কথায়, সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'একে কি বলে, জানো ? পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় ! আরে আনন্দেও কেউ কাঁদে নাকি ! আমি জন্মেও শুনিনি বাপু !'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, কাঁদে। অনেক দুঃখের পর, হঠাৎ একটু আনন্দের ঝলকানিতেও মানুষ কাঁদে। শুধু বৈশাখীর সঙ্গে টেলিফোনেই নয়। সারাদিন ধরে কত কেঁদেছি, তুমি জানো না ! আসলে হঠাৎ আচমকা এত ভালবাসা, এত সুখ সামনে এসে দাঁড়ালে, কী করে সহ্য করি বলো !'

সেলিম দেখে, কথা বলতে-বলতে শ্রেয়া কাঁদছে। ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে ওর দু'গণ্ড বেয়ে। দু'টি জলে ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে সেলিম বলে, 'কী হয়েছে তোমার শ্রেয়া, আজ এমন আনন্দের দিনেও তুমি কাঁদবে, বলো !'

শ্রেয়া শাড়ির আঁচলে দুটো চোখ মুখে বলে, 'না। বিশ্বাস করো তুমি, কাঁদতে চাই না। কিন্তু পোড়া দু'টি চোখ বারণ মানে না যে।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম বলে, 'সারাদিন ধরে ভেবেছি, কখন তোমাকে সুসংবাদটা দেব। ভেবেছি, তুমি শুধু খুশি হবে না, খুব খুশি হবে। কিন্তু কোথায় তোমার খুশি হওয়া ! তুমি কি না ভেউভেউ করে কান্না শুরু করে দিয়েছ !'

জল টলমল চোখে কেন যেন একপলক মাথা তুলে তাকায়। তারপর মাথা নিচু করে আবার বলে, 'এতদিন ধরে কেবল দুঃখের মধ্যেই রাত-দিন পার হয়েছে। ভেবেছি, বাকি জীবনটাও বোধহয় দুঃখ আর কষ্টের মধ্যেই কেটে যাবে। ভাগ্য বলে মেনেও নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এটাই বোধহয় আমার জীবন। এর বেশি আমার বোধহয় চাওয়ারও আর কিছু নেই, পাওয়ারও আর কিছু নেই। ঠিক তখনই তুমি জীবনে এলে।'

শ্রেয়া থামে। শ্রেয়াকে থামতে দেখে সেলিম বলে, 'শুনতে ভাল লাগছে না। থামতে বললেও তো থামবে না। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে এক সাথে। শুনতে না চাইলেও, শুনতে হবে। তাই কী আর করি, তুমি বলো ? হ্যাঁ, আমি কান পেতে আছি শোনার জন্যে।'

সেলিমের কথা শোনে কী না শোনে কে জানে ! দু'চোখ মুছে শ্রেয়া আবার বলে, 'আমার এই দুঃখী জীবনে তুমি এলে, এ কথার মানে কি জানো ?

সেলিম হেসে বলে, 'বলো, শুনি ?'

দু'চোখ মুছে শ্রেয়া বলে, 'তুমি এলে মানে, আমার ভালবাসাহীন এ জীবনে ভালবাসা এল। সুখ এল। আনন্দ এল। আমার স্বপ্নহীন এ জীবনে, স্বপ্ন এল। আমি স্বপ্ন দেখলাম।'

সেলিম ক্রন্দনরত শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে বলে, 'তাই ?'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, তাই। স্বপ্নের মতো ভালবাসা, সুখ, আনন্দ হঠাৎ আচমকা এসে হাজির হল আমার জীবনে। শুনেছি, দুঃখের রাত নাকি শেষ হয় না। হ্যাঁ, সেলিম। তুমি এলে। আমার জীবনে এত দুঃখের দীর্ঘ রাতও শেষ হয়ে গেল।'

সেলিম কেন যেন এবার আর কিছু বলে না। কেবল হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে।

শ্রেয়া যে থেমে থাকে তা নয়। বলে, 'একটা কথা বলব, সেলিম ?'

সেলিম হেসে বলে, 'বলো ?'

মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর দু'গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়া ফোঁটা-ফোঁটা জল মুছে বলে, 'স্বপ্নের মতো তুমি এসেছ। ঘুম ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে যদি দেখি তুমি নেই, তাহলে ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে হাসে। হেসে বলে, 'কী আর করবে ? এখন যেমন ভেউভেউ করে কাঁদছ, তখনও তেমন ভেউভেউ করে কাঁদবে। ব্যস, হয়ে গেল।'

শ্রেয়ার হঠাৎ কী হয় কে জানে ! দু'চোখ তুলে তাকায়। দু'টি জলে ডোবা চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুমি হাসছ সেলিম ! আমার দুঃখ, আমার ব্যথা-বেদনার কথা শুনে তুমি হাসছ !'

শ্রেয়ার এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকানো দেখে যে, সেলিম দমে যায় তা নয়। বরং একইরকম হেসে বলে, 'তুমি কি বলো, আমিও তোমার মতো কাঁদব! তাহলে বলো, কাঁদি।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে, দূরে লেকের শান্ত নীল জলের দিকে তাকিয়ে খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'ভাবতে পারো তুমি, একটা মেয়ের বিয়ে হল। কিন্তু বিয়ের রাতে জানা-অজানা অনেক স্বপ্ন নিয়ে সেজেগুজে থাকা সেই মেয়েটা ধর্ষিত হল। এমন মেয়ে এ পৃথিবীতে আর ক'জন আছে, বলো ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই বলে, 'ক'জন আছে, জানি না। তবে একজন আছে, তা জানি। তবে হ্যাঁ, সেই একজনের সাথে দেখা না হলে, আমার জীবনটা আর জীবন থাকত না। একেবার মরুভূমি হয়ে যেত।'

লেকের শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে থেকেই শ্রেয়া আবার বলে, 'তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না ?'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ, বাসি। তবে কতটা ভালবাসি তা বলতে পারব না।'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'কেন !'

সেলিম ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো দুষ্টুমির হাসে ঝুলিয়ে বলে, 'বারে, আমি জানি নাকি কতটা ভালবাসি। ভালবাসা মাপার কোনও যন্ত্র আছে নাকি যে, মেপে-টেপে তোমাকে বলব। তবে ভাল যে বাসি, এটা বলতে পারি।'

কী হয় কে জানে ! শ্রেয়া এবার অঝোর বৃষ্টির মতো কেঁদে বলে, 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। সত্যি বাঁচব না, সেলিম।'

সেলিম হেসে বলে, 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব, কে বলল তোমাকে ?'

কাঁদে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, 'সত্যি বলছ ? তুমি সত্য বলছ, সেলিম ?'

শ্রেয়ার এত কান্না দেখে সেলিমের বোধহয় ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে যায়। অধৈর্য হয়ে তাই বলে, 'না। তোমার কথার আর কোনও উত্তর দেব না আমি, বুঝেছ ?'

দু'টি জলে ভেজা চোখে তাকিয়ে, অসহায়ের মতো বলে, 'কেন !'

সেলিম এবার সত্যি রেগে যায়। রেগে-মেগে বলে, 'আচ্ছা, তোমার চোখের পানি কি শুকায় না, বলো তো ? এক সমুদ্র পানি আছে নাকি তোমার চোখের ভেতরে ! কাঁদছ তো কাঁদছই ! চোখের এই পানি যেন শেষই হচ্ছে না।'

সেলিমকে রাগ করতে দেখে শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'ইয়ে মানে, আমি –'

মুখের কথা শেষও করতে দেয় না। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেলিম বলে, 'আরে, রাখো তোমার যত ইয়ে মানে। তুমি থামবে কি না, বলো ? নইলে আমি চললাম।'

সেলিমের কথা শুনে দ্রুত দু'চোখ মুছে বলে, 'ঠিক আছে, কাঁদব না। আর কাঁদব না।'

শ্রেয়াকে অসহায়ের মতো বলতে দেখে দ্রুত রাগ গলে যায়। নিজের অজান্তেই আবার ফিক্ করে হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'ঠিক তো ? আর কাঁদবে না তো ?'

অনেকক্ষণ পর প্রথম কষ্ট করে হলেও শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'না। কাঁদব না।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে কি না কে জানে, সেলিম এবার বলে, 'চাকরি হয়ে গেছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করতে হবে। তা চাকরি তো হল। চাকরি হবার পরে কি, জানো তো ?'

শ্রেয়া বড়-বড় দুটো চোখে তাকিয়ে বলে, 'কী ?'

সেলিম হেসে বলে, 'চাকরির পর বিয়ে, বুঝেছ ?'

সেলিমের মুখে বিয়ের কথা শুনে শ্রেয়া লজ্জা পেয়ে হাসে। কিন্তু কেন যেন কিছু বলে না। মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকে।

শ্রেয়াকে লজ্জা পেতে দেখে, সেলিম যে চুপ থাকে তা নয়। সে বলে, 'বিয়ের পর কি, তা জানো তো ? নাকি তাও আবার জানো-টানো না ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে মাথা নিচু করেই হেসে বলে, 'বিয়ের পরে তো সুখে ঘর-সংসার করা। বিয়ের পরে আবার কী ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই হেসে বলে, 'বিয়ের পরে কী, তাও জানো না ? আরে বিয়ের পরেও আমরা কি দু'জন থাকব নাকি ?'

সেলিমের কথা শ্রেয়া বুঝতে পারে না। তাই দ্রুত বলে, 'তার মানে !'

হাসে। মিষ্টি হেসে সেলিম বলে, 'বুঝতে পারছ না কেন ? দু'জন বেড়ে আমরা তিন-চারজন হয়ে যাব না ? বোকা কোথাকার, আরে আমাদের ছেলেপুলে হবে না ?'

না। বুঝতে আর অসুবিধা হয় না। ব্যস, এতই লজ্জা পায় যে, আর কিছুই বলতে পারে না।

শ্রেয়াকে লজ্জা পেতে দেখে, সেলিম মজা পায়। মজা পেয়ে বলে, 'আমি কিন্তু খুব বেশি দিন ধৈর্য ধরতে পারব না, শ্রেয়া। এ আমি সাফ-সাফ বলে রাখলাম।'

সেলিমের কথা শ্রেয়ার বোঝার কথা নয়। বুঝতে পারেও না সে। তাই বলে, 'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। খুব বেশি দিন ধৈর্য ধরতে পারবে না, মানে !'

শ্রেয়ার মুখের কথা শেষও হয় না, সেলিম দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ। বিয়ের পর-পরই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, যে কোনও একটা সন্তান চাই আমার, ব্যস।'

শ্রেয়ার লজ্জার যেন অন্ত থাকে না। লজ্জায় লাল হয়ে তাই বলে, 'ধ্যাৎ, মুখে কিছুই আটকায় না। মুখে যা আসে, তাই বলছ কেন, বলো তো ? লজ্জা-শরমের মাথা খেয়েছ নাকি তুমি ?'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'জানো তো, লজ্জা, মান, ভয়– এই তিন থাকতে নয়। হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট কথা, বিয়ের পর-পরই একটা কচি মানব শিশু চাই আমার। চাই মানে, বিয়ের দু'-তিন মাসের মধ্যেই চাই আমার। ধৈর্যই ধর্ম, ওসব বললে কিন্তু চলবে না, বুঝেছ ?'

লজ্জায় সিঁদুরের মতো লাল হয়েও সেলিমের কথায় এবার হাসে শ্রেয়া। হেসে বলে, 'হ্যাদারাম কোথাকার ! কিচ্ছু জানে না ! বিয়ের দু-তিন মাসের মধ্যে বাচ্চা হয় নাকি কারও ! জন্মেও শুনিনি বাপু। সত্যি, সব পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া কোনও গুণই তোমার নেই। গাধা ! সত্যি এমন গাধা জীবনে আর দেখিনি।'

সেলিম হাসে। হেসে বলে, 'সত্যি কোনও গুণই আমার নেই। কিচ্ছু জানি না। তা বিয়ের পরে এই আনাড়ী মানুষটার হাতে পড়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে, এখন থেকেই খানিকটা প্রাকটিক্যাল শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে হয় না, ম্যাডাম ?'

সেলিমের কথা শুনে, শ্রেয়াও যে হাসে না তা নয়। হেসে বলে, 'এই, তোমার আজ কী হয়েছে ! গুন্ডার মতো এসব কী বলছ, বলো তো !'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'ঠিক আছে। আর গুণ্ডা কথা বলব না। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। বিয়ের পর-পরই বাজারের থলেটা কিন্তু হাতে ধরিয়ে দিও না। সব সহ্য করতে পারি। কিন্তু কাঁচা বাজার করা আমি সহ্য করতে পারি না, লক্ষ্মীটি।'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'একদম না ?'

সেলিমও হাসে। হেসে বলে, 'না। একদম না, বুঝেছ ?'

এমনিতে খুব শব্দ করে হাসে না। এবার কিন্তু খিলখিল করে হাসে শ্রেয়া। হেসে বলে, 'তাহলে আজকের বাজারের কী হবে ? বাবার পছন্দের গলদা চিংড়ি, বৈশাখীর পছন্দের গরুর মাংস-পোলাওর চাল এবং তোমার পছন্দের সরিষা ইলিশের জন্যে বড়সড় একটা ইলিশ মাছ, কে কিনবে, বলো তো ?'

বুঝতে বাকি থাকে না, টেলিফোনে বৈশাখী একটা শব্দও বলা বাকি রাখেনি। হেসে বলে সেলিম, 'বৈশাখী তোমাকে সব বলে দিয়েছে, না ?'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে হেসে বলে, 'বলবে না কেন ? বৈশাখী আমাকে ভালবাসে না ?'

শ্রেয়ার এ কথার উত্তরে সেলিম কী যেন ভাবে ! কেন যেন কিছু বলে না।

চন্দ্রিমা উদ্যানের ঘাসের ডগায়, লেকের জলে, দেবদারু গাছের সবুজে ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা নামে। উদ্যানের একটা দুটো করে ঘাস ছিঁড়ে আনমনে দাঁতে কেঁটে শ্রেয়া বলে, 'একটা কথা বলব, সেলিম ?

সেলিম বলে, 'বলো, শ্রেয়া ?'

আনমনে খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'তোমার চাকরি হয়ে গেছে। আমার খুশি হওয়ার কথা। আমি কিন্তু খুশি হতে পারিনি, জানো ?'

হতবাক হয়ে যায় সেলিম ! শ্রেয়ার কথা শুনে দ্রুত বলে, 'কী বলছ তুমি, শ্রেয়া !'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, খুশি হইনি।'

সেলিম যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলে, 'কেন, শ্রেয়া ! কেন ! খুশি হওনি কেন তুমি, বলো !'

নিজের অজান্তেই বোধহয় আবার কেঁদে ফেলে ! কেঁদে দু'চোখ মুছে বলে, 'বারে, তুমিই তো বলেছ, চাকরির পরে বিয়ে। তোমার মা-বাবা তোমার জন্যে এবার কনে দেখবেন না ? বিয়ে ঠিকঠাক করবেন না ?'

সেলিম বুঝতে পারে, শ্রেয়া কী বলতে চায়। তাই হেসে বলে, 'বেশ তো, হবে। বিয়ে হবে। বাসর রাত হবে। আরও কত কী হবে। বেশ মজা হবে, তাই না শ্রেয়া ?'

মাথা নিচু করে খানিক কী ভাবে শ্রেয়া ! তারপর বলে, 'তা কনেটা কে, বলো ?'

কী হয় কে জানে ! শ্রেয়ার এ প্রশ্ন শুনে, সেলিমের মাথায় ছলাৎ করে বোধহয় এক চিলতে রক্ত উঠে যায়। তাই দ্রুত বলে, 'ছি শ্রেয়া, ছি ! এতদিন পরেও তুমি প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চাও ! তুমি জানো না, কনে কে ! কী তার নাম !'

সেলিমের এই হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে, অসহায়ের মতো কোনওমতে বলে, 'অভাগী মেয়ে আমি। এত ভালবাসা, এত সুখ দেখে সত্যি ভয় হয়। তোমার বাবা-মা রাজি হবেন তো ? ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তুমি। আমার মতো একটা মেয়ে সেজেগুজে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াব ! ভাবতেই ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে আমার, জানো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিম এতটাই রেগে যায় যে, বেশ উচ্চস্বরে বলে, 'কেন ! আমার পাশে তোমাকে মানাবে না কেন, বলো ! কী নেই তোমার ! কেন নিজেকে এত অযোগ্য ভাব তুমি ! কেন !'

সেলিমের কথা শুনে, দু'চোখ মুছে বলে, 'তুমি সত্যি খুব ভাল সেলিম।'

শ্রেয়ার এ কথা শুনে বোধহয় আরও রেগে যায়। রেগে বলে, 'কী হল ! হঠাৎ এত প্রশংসাপত্র দিতে শুরু করলে !'

সেলিমের এত রাগ দেখে শ্রেয়া ম্লান হেসে বলে, 'তুমি কি বলো, তোমার মা-বাবা আমাকে মেনে নেবেন ! একটা ধর্ষিত মেয়েকে, কোনও মা-বাবা পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে রাজি হবেন না। রাজি হতে পারেন না সেলিম। তুমি বুঝতে পারছ না।'

শ্রেয়ার কথায় সেলিম এতটাই রেগে যায় যে, আর কোনও কথা না বলে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। সেলিমকে উঠতে দেখে শ্রেয়াও দাঁড়ায়।

সেলিম তখনও রাগে ফুঁসছে। দাঁতে দাঁত চেপে কেবল বলে, 'চলো, যাই।'

শ্রেয়াও আর কিছু বলে না। সেলিমের পাশাপাশি হেঁটে চন্দ্রিমা উদ্যান থেকে বেরিয়ে আসে।

রাশভারী মানুষ বলতে যা বোঝায় আফজাল হোসেন ঠিক তাই। এমনিতে কথা বলেন খুব কম। যা বলেন, মেপে-মেপে বলেন।

কিন্তু আজ যে কী হয়েছে কে জানে ! আজ চেহারা যেন একেবারে অন্যরকমের ! অনেক দিনের নিয়ম ভেঙে অনর্গল কথা বলছেন ! হো-হো করে অনবরত হাসছেন !

খাবার টেবিলে বাবাকে এরকম কখনওই দেখেনি সেলিম। তাই সে খেতে-খেতে বাবাকে দেখে। কিন্তু কিছু বলে না।

তাই বলে বৈশাখী যে চুপ করে থাকে, তা নয়। বৈশাখী বলে, 'বাবা, হাসতে-হাসতে, কথা বলেতে-বলতে তুমি কিন্তু খুব বেশি খেয়ে ফেলছ। তোমার হাই প্রেসার। এটা ভুললে চলবে না।'

হো- হো করে হাসেন। হেসে আফজাল হোসেন বলেন, 'না রে, মা। আজ আমি কোনও কথা শুনতে রাজি নই। আজ আমি পেটপুরে খাব। অনেকদিন পর আজ কত আনন্দ আমাদের, তাই না রে বৈশাখী ?'

বাবার কথা শুনে বৈশাখী যেন থ' হয়ে যায়। না। বহুদিন বাবা তার সাথে এভাবে কথা বলেননি। এতটাই অবাক হয়ে যায় যে, মুখরা মেয়ে বৈশাখীও আর কিছু বলতে পারে না।

হো-হো করে হেসে আফজাল হোসেন এবার বলেন, 'জীবনের প্রতিটি দিন যদি এমন আনন্দের হত রে মা, তাহলে আর কোনও দুঃখই থাকত না।'

না, বৈশাখী এবারও কিছু বলে না। খেতে-খেতে অবাক হয়ে কেবল বাবাকে দেখে।

আফজাল হোসেন এবার মরিয়ম বেগমের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমাকে আর একটা গলদা চিংড়ি দেবে, সেলিমের মা ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'আরও একটা দেব ? শরীর খারাপ করবে না তো ?'

আফজাল হোসেন বলেন, 'হ্যাঁ, খাব। এত আনন্দ আমি কবে পেয়েছি, বলো ? আজ আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি দেখে নিও। আর হ্যাঁ, আমার এগার বছর ধরে ঝুলে থাকা প্রমোশনটাও বোধহয় এবার হয়ে যাবে, সেলিমের মা।'

মরিয়ম বেগম কিছু বলার আগেই বৈশাখী বলে, 'সত্যি বলছ বাবা ! সত্যি বলছ তুমি !'

এমনিতে পারতপক্ষে মিথ্যে বলেন না। অন্যায়, শঠতা, মিথ্যে এসব থেকে বরাবর গা বাঁচিয়ে দূরে থাকেন। অন্যসময় হলে বৈশাখীর একথায় স্বভাবতই রেগে-মেগে আগুন হয়ে যেতেন। কিন্তু আজ রাগ করা তো দূরে থাক, বরং হেসে বলেন, 'শুধু প্রমোশন নয়। আরও সুখবর আছে, বুঝলি বৈশাখী ? বড় সাহেব সেলিমের নিয়োগপত্রটা পড়েই আমাকে বসতে বললেন। আমি বসতেই তিনি হেসে কি বললেন, জানিস ? বললেন, আপনার প্রমোশনটা অনেকদিন ধরে ঝুলে আছে, তাই না আফজাল সাহেব ? হবে। বলছি এবার প্রমোশনটা হয়ে যাবে আপনার ।'

আফজাল হোসেন থামতেই বৈশাখী হেসে বলে, 'বাবা, একদিনে এত খুশি ! আমি তো সহ্যই করতে পারছি না। আমার এখন কি করতে ইচ্ছে করছে, জানো মা ? এত খুশিতে ধিতাং-ধিতাং করে নাচতে ইচ্ছে করছে।'

কী অদ্ভুত, বৈশাখীর হড়হড় করে বলা কথা শুনে আফজাল হোসেন কেন যেন রাগ করেন না। বরং হেসে বলেন, 'এরপর এত বদমেজাজী মানুষ বড় সাহেব, কি করলেন জানিস ? আমাকে অবাক করে দিয়ে, আমার জন্যে বয়কে ডেকে চায়ের জন্যে বললেন। চা খেতে-খেতে যে কাণ্ড করলেন, তোকে আর কী বলব, বৈশাখী !'

বাবাকে থামতে দেখেই বৈশাখী বলে, 'কী বললেন, বলো না বাবা ?'

আফজাল হোসেন গলদা চিংড়ির শেষ টুকরোটা মুখে দিয়ে বলেন, 'ড্রয়ার থেকে একটা ছবি সমেত খাম বের করে হাতে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের ছবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অনার্স পড়ে। আমি তো আসলে তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। ছবিটা হাতে নিয়ে বললাম, ছবিটা দিয়ে আমি কী করব, স্যার ? না। অন্যদিনের মতো আমার কথা শুনে রেগে গেলেন না। বরং হো-হো করে হাসেন। হেসে বলেন, দেখেন আফজাল সাহেব, পুত্রবধূ করে নিতে পারেন কি না, দেখেন।'

মাথার ওপর খান্‌খান্‌ করে আকাশ ভেঙে পড়লেও, এত অবাক হত না সেলিম। ঘটনার আকস্মিকতায় যেন হতবাক হয়ে যায় সে !

বৈশাখীরও অবস্থা একইরকম। খাওয়া ফেলে হতবাক হয়ে বাবাকে কেবল দেখে। ছোটবেলা থেকেই কথার পিঠে কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কী বলবে না বলবে তাও যেন ভুলে যায় সে।

বৃদ্ধ আফজাল হোসেনের চোখ-মুখ যেন অন্তহীন খুশিতে ঝলমল করছে। তাঁর এত কথা শুনেও কাউকে কিছু বলতে না দেখে যে, তিনি যে চুপ করে থাকেন তা নয়। হেসে বলেন, 'আমার কিন্তু ছবি দেখে পছন্দ হয়েছে।'

মরিয়ম বেগম এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন। এবার বলেন, 'আমারও বেশ পছন্দ হয়ছে বাবা।'

ঘটনার আকস্মিকতায় সেলিম এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না।

খেতে-খেতে আফজাল হোসেন এবার বলেন, 'খাওয়ার পরে তুমি একবার আমাদের ঘরে এসো, সেলিম। তখন ছবিটাও দেখবে। তোমার সাথে কথাও হবে।'

আফজাল হোসেনের বোধহয় খাওয়া হয়ে যায়। তিনি বেসিনে হাত ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যান।

মরিয়ম বেগম তখনও খাননি। একসঙ্গে বসে তিনি কখনও খান না। সবার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে, তবেই তিনি খেতে বসেন।

মরিয়ম বেগম আফজাল হোসেন চলে যেতেই বলেন, 'তোরা খা বাবা। কিছু লাগলে নিয়ে নিস্। আমি তোর বাবাকে পান বানিয়ে দিয়ে আসি।'

'আসি' বলে যে আর অপেক্ষা করেন, তা নয়। দ্রুত চলে যান মরিয়ম বেগম।

মা চলে যেতেই বৈশাখী বলে, 'এখন কী হবে, ভাইয়া ?'

সেলিম বলে, 'কী আবার হবে ! বললেই হল, বড় সাহেবের ইতিহাসে অনার্স-পড়া মেয়েকে বিয়ে করো ! নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার যেন কোনও দামই নেই !'

বৈশাখী অসহায়ের মতো বলে, 'আমার কিন্তু খুব ভয় করছে রে, ভাইয়া।'

বৈশাখী এ কথার উত্তরে, সেলিম কেন যেন আর কিছু বলে না। বেসিনে হাত ধুয়ে, নিজের শোবার ঘরের দিকে চলে যায়।

নিজের ধরে এসেও খুব বেশিক্ষণ যে বসে, তা নয়। বাবা-মা'র ঘরে এসে ঢোকে। সেলিমকে ঘরে ঢুকতে দেখে মরিয়ম বেগম বলেন, 'আয়, বোস বাবা।'

সেলিম কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে।

আফজাল হোসেন বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পান চিবুচ্ছিলেন। এবার সেলিমকে দেখে বিছানায় উঠে বসেন। বসে বলেন, 'ছবিটা কি এখন দেব বাবা ? দেখবি ?'

সেলিমের মুখ-চোখ গম্ভীর, থমথমে। সে বলে, 'না। দেখব না, বাবা।'

সেলিমের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে এবং কথা শুনে, আফজাল হোসেন হতবাক হয়ে যান ! তিনি দ্রুত বলেন, 'কেন ! দেখবি না, কেন !'

আফজাল হোসেনের কথা শেষ হতে না হতেই সেলিম বলে, 'বাবা, তোমাকে আজ আমি ক'টা প্রশ্ন করি ? কিছু মনে করবে না তো ?'

এতটাই হতবাক হয়ে যান যে, কী বলবেন না বলবেন কিছুই বুঝতে পারেন না আফজাল হোসেন।

সেলিম বলে, 'তুমি কখনও মিথ্যে বলেছ ? করো সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছ, বলো বাবা ?'

দ্রুত চোখ দু'টি লাল হয়ে যায় আফজাল হোসেনের। ফ্যালফ্যাল করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এ প্রশ্নের জবাবে কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারেন না।

সেলিম বলে, 'আমি জানি, জানা মতে তুমি খুব কমই মিথ্যে বলেছ। শঠতা, প্রবঞ্চনা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রাইভেট ফার্ম হলেও, টুকটাক ঘুষ খাওয়ার সুযোগ তোমার ছিল। কিন্তু তুমি কখনও তা খাওনি। কিন্তু এখন ?'

আর চুপ করে থাকতে পারেন না বৃদ্ধ। গর্জে ওঠেন। গর্জে উঠে বলেন, 'কী হয়েছে এখন ! বল, কী হয়েছে !'

মরিয়ম বেগম বাপ-ছেলের কথা-বার্তা শুনে, স্বভাবতই ঘাবড়ে যান। ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, 'তোমরা বাপ-ছেলে কী শুরু করেছ, বলো তো !'

সেলিম মা'র কথা শুনে কী না শোনে কে জানে ! সে একইরকম বলে, 'এতদিন পরে হঠাৎ তোমার বড় সাহেবের মন-প্রাণ তোমাকে প্রমোশন দেয়ার জন্যে উথলে উঠল কেন, বলো তো বাবা ? তুমি বুঝতে না পারলেও, আমি বুঝতে পারছি।'

রাগে, দুঃখে, অভিমানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আফজাল হোসেন এবার সজোরে চিৎকার করে বলেন, 'কী বলতে চাস তুই ! বল, কী বলতে চাস !'

বাবার হুংকার শুনে সেলিম যে চুপ করে যায়, তা নয়। সে একইরকম বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না বাবা, ভদ্রলোক ওনার মেয়েকে তোমার পুত্রবধূ

করার জন্যে, তোমাকে আজ চা খাইয়েছেন। তোমাকে খুশি করার জন্য এ্যদ্দিন পর প্রমোশনের কথা বলেছেন। আমি তো মনে করি, এটা উনি তোমাকে তোমার ছেলের বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছেন অথবা ঘুষ দিচ্ছেন। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না।'

সেলিমের একথা শুনে, রাগে গরগর করতে থাকেন আফজাল হোসেন। স্বামীকে বিবাহিত জীবনের এই বত্রিশ বছরে কখনও এত রাগতে দেখেননি মরিয়ম বেগম। তিনি ছুটে এসে স্বামীকে ধরে বলেন, 'তুমি শান্ত হও। দয়া করে শান্ত হও। ডাক্তার তোমাকে রাগারাগি করতে বারণ করেছেন।'

রাগে কাঁপতে থাকেন আফজাল হোসেন। কোনওমতে বলেন তিনি, 'তুমি ওকে চলে যেতে বলো, সেলিমের মা। ওকে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে চলে যেতে বলো।'

কী ভেবে সেলিম আর কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে, নিজের ঘরে এসে ঢোকে।

সেলিম নিজের রুমে এসে ঢুকতেই, পেছন-পেছন উদ্বিগ্ন মুখে বৈশাখীও তার রুমে এসে ঢোকে। হাসি-খুশি মুখের বৈশাখীকে খুব কমই এত উদ্বিগ্ন দেখেছে সেলিম।

বৈশাখী বলে, 'ভাইয়া।'

সেলিম বলে, 'বল ?'

বৈশাখী নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলে। ছলছল দুটো চোখ তুলে সে বলে, 'এখন কী হবে ভাইয়া ?'

সেলিম বুঝতে পারে, নিজেরও দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে কোনওমতে বলে, 'আমি জানি না, বৈশাখী। আমি কিচ্ছু জানি না।'

ওড়নায় দুটো চোখ মুছে বৈশাখী বলে, 'শ্রেয়া আপুর মতো এত ভাল মেয়ে আমি জীবনে আর দেখিনি, ভাইয়া। ওনার জীবনের, সব কথা উনি আমাকে বলেছেন।'

বৈশাখীর কথা শুনে সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'তোকেও বলেছে।'

বৈশাখী মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ, বলেছে। বলেছি তো ভাইয়া, এত ভাল সত্যি আমি আর জীবনে দেখিনি।'

বৈশাখীর কথা শেষ হতেই, অশ্রুভারাক্রান্ত দুটো চোখে তাকিয়ে সেলিম বলে, 'আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, বৈশাখী। তুই এখন যা তো। আমাকে একটু একা থাকতে দে।'

সেলিমের কথা শুনে বৈশাখী যে চলে যায় তা নয়। বরং এক পা-দু'পা করে সেলিমের আরও কাছে গা ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

দু'টি ভেজা চোখে তাকিয়ে সেলিম বলে, 'কিছু বলবি, বৈশাখী ?'

বৈশাখীর দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। কেঁদে কোনওমতে বলে সে, 'আমাকে শ্রেয়া আপু কত ভালবাসে, তোমাকে আমি বলে শেষ করতে পারব না, ভাইয়া।'

বৈশাখীকে এভাবে কাঁদতে দেখে, সেলিম বোনকে আরও কাছে টেনে নেয়। তারপর নিজের চোখে এত জল নিয়েও, ওড়নায় তার অশ্রুভেজা দু'টি চোখ মুছে দেয়।

বৈশাখীও যে থেমে থাকে তা নয়। ওড়না দিয়ে ভাইয়ার দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়া ফোঁটা-ফোঁটা জল দ্রুত মুছে দেয়।

সেলিম বৈশাখীকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে, আবার কেঁদে ফেলে। কেঁদে বলে, 'ছোটবেলা থেকে বাবার চোখে চোখ তুলে কখনও কথা বলিনি। এই প্রথম আজ বাবার সঙ্গে মুখে-মুখে কথা বললাম। বাবা মনে খুব ব্যথা পেয়েছেন, তাই না রে, বৈশাখী ?'

বৈশাখী ক্রন্দনরত ভাইয়ের মাথায়-চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলে, 'আমার মনে হয় তোমার মাকে সব বলা উচিৎ, ভাইয়া।'

বৈশাখীর কথা বোধহয় শেষও হয় না, মরিয়ম বেগম খাওয়া-দাওয়া শেষে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে, সেলিমের ঘরে এসে ঢোকেন। ঘরে ঢুকেই ভাই-বোন দু'জনকে একসঙ্গে দেখে বলেন, 'কী ব্যাপার ? ফিস্‌ফিস্ করে ভাই-বোন দু'জনে মিলে কী শলা-পরামর্শ হচ্ছে ?'

মাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বৈশাখী জাপটে ধরে বলে, 'তুমি আমাদের মা। ঠিক কি না, বলো ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'আরে, আমি তোদের মা না তো কি রে, পাগলী মেয়ে ?'

বৈশাখী তখনও মাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ছাড়েনি। একইরকম জড়িয়ে ধরেই, আবদারের সুরে সে এবার বলে, 'তুমি এবার বাবার দলে যাবে, নাকি আমাদের দলে থাকবে, বলো ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তোরা দু'জন দল বেঁধেছিস নাকি।'

বৈশাখী বলে, 'হ্যাঁ, বেঁধেছি। আমি ভাইয়ার দলে। তুমি কোন দলে থাকবে, বলো ? তোমাকে বিশ্বাস নেই মা। আমি দেখেছি, ভেতরে-ভেতরে

বাবার জন্যে তোমার খুব টান। বাবাকে তুমি খুব ভালবাস, এটা আমি জানি।'

মরিয়ম বেগম নিঃশব্দে নয়, বেশ শব্দ করেই হাসেন। হেসে বলেন, 'পাগলী মেয়ে, তুই তোর বাবাকে ভালবাসিস না ?'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'ধ্যাৎ, বাবাকে ভালবাসে না, এই দুনিয়ায় কেউ আছে নাকি !'

মরিয়ম বেগম এবার বলেন, 'তা এত দলাদলি শুরু করেছিস কেন, বল তো ?'

মা'র কথার উত্তরে সেলিম কিছু বলার আগেই বৈশাখী বলে, 'একটা মেয়ে মা। হালকা পাতলা গড়ন। গায়ের রং ফর্সা। জীবনানন্দের বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো দুটো বড়-বড় চোখ। দীঘল কালো চুল। একবার নয়, বার-বার দেখতে ইচ্ছে করে এমন একটা মুখ। শুধু সুন্দরী বললে ভুল বলা হবে। রূপসী, মা। যাকে বলে রূপসী।'

মরিয়ম বেগম ঘটনা আঁচ করতে পারেন না তা নয়। তবু বলেন, 'বুঝলাম। তা এ মেয়েটার সঙ্গে দলাদলির সম্পর্ক কী, বল তো ?'

না, মা'র কথার উত্তরে সেলিম এবারও কিছু বলতে পারে না। বৈশাখীই আবার বলে, 'আরে, বুঝতে পারছ না মা ! ভালবাসে যে।'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর কথা শুনে দ্রুত বলেন, 'কে ভালবাসে ? কাকে ভালবাসে ?'

মা'র প্রশ্নের উত্তরে বৈশাখী দ্রুত বলে, 'ভাইয়া। হ্যাঁ, ভাইয়া ভালবাসে।'

মরিয়ম বেগম বলেন, 'কাকে ভালবাসে ? কী নাম তার ? কোথায় থাকে ?'

ব্যস, মা'র কথা শুনে ফাঁটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। না, আর কিছুই বলতে পারে না বৈশাখী।

বৈশাখীর সঙ্গে কথার মধ্যে, সেলিমের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেননি। এবার কিছু বলবেন বলে বোধহয় মরিয়ম বেগম ছেলের মুখের দিকে তাকান। দেখেই চমকে ওঠেন। দ্রুত বলেন তিনি, 'সেলিম, তুই কাঁদছিস বাবা !'

সেলিম কোনওমতে কান্না লুকিয়ে বলে, 'না, মা। কাঁদছি না। কাঁদছি না তো।'

এবার ছেলের কাছে এসে, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মরিয়ম বেগম বলেন, 'মা'র কাছে কোনও কথা লুকাতে নেই বাবা। আমি শুধু তোর মা নই। বন্ধুও বাবা। ঠিক বলিনি, বল ?'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, মা। তুমি শুধু আমার মা নও। বন্ধুও।'

মরিয়ম বেগম নিজের শাড়ির আঁচলে ছেলের চোখ-মুখ মুছে দিয়ে বলেন, 'কাকে ভালেবেসেছিস তুই ? কে সে ? আমাকে বলবি না, বাবা ?'

সেলিম মাথা নিচু করে বলে, 'বলব, মা।'

ছেলের কথা শুনে মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তো বল, সেই সুন্দরীর নাম ? যাকে তুই আমার চেয়েও বেশি ভালবাসিস ?'

মা'র কথা শুনে সেলিম লজ্জা পেয়ে বলে, 'ধ্যাৎ মা, তোমাকেই তো বেশি ভালবাসি। ওকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসতেই পারি না। তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি, কে বলল তোমাকে ?'

সেলিমের কথায় মরিয়ম বেগম মুচকি হাসেন। মুচকি হেসে বলেন, 'কী জানি, একটা মেয়ের জন্যে বাপের সঙ্গে যেভাবে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করে এলি, তার ওপরে আবার ঘরে বসে চুপি-চুপি ভাই-বোনে কান্নাকাটি শুরু করেছিস, আমি তো ভাবলাম আমি না, ঐ মেয়েটাকেই হয়তো বেশি ভালবাসিস তুই।'

মা'র কথা শেষ হতেই সেলিম বলে, 'কী বলছ মা তুমি ! মা'র চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি, বলো ? হ্যাঁ, তোমাকেই আমি বেশি ভালবাসি, বুঝেছ মা ?'

ছেলের কথা শুনে মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তা নাম-ধাম সব বল ? দেখি, তোর বদরাগী বাবাকে বলে-কয়ে কতটা কী ম্যানেজ করতে পারি।'

মা'র কথা শুনে সেলিম দ্রুত মাকে জড়িয়ে ধরে, কপালে একটা আলতো চুমু খেয়ে বলে, 'তুমি এত ভাল কেন মা, বলো তো ?'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই বৈশাখী কেঁদে বলে, 'হ্যাঁ, মা। পৃথিবীতে তুমি হচ্ছ আমাদের সবচে' ভাল মা।'

বৈশাখীকে আবার কাঁদতে দেখে মরিয়ম বেগম বলেন, 'এই পাগলী মেয়ে, তুই আবার কাঁদছিস কেন, বলতো ?'

কথা বলতে-বলতে নিজের অজান্তেই মরিয়ম বেগমও কেঁদে ফেলেন।

মরিয়ম বেগমকে কাঁদতে দেখে সেলিম বলে, 'তুমি কাঁদছ মা !'

মরিয়ম বেগম দ্রুত নিজের চোখ মুছে, চোখের জল লুকিয়ে কোনওমতে বলেন, 'না। কই, কাঁদছি না তো ।'

সেলিম নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে, মা'র দু' চোখ মুছে দিয়ে বলে, 'লুকিয়ে কী লাভ মা ? হ্যাঁ, তুমি কেঁদে ফেলেছ। আমাকে এত ভালবাস তুমি। আমার দুঃখে তুমি কি না কেঁদে থাকতে পারো ?'

সেলিমের কথার পিঠে মরিয়ম বেগম কিছু বলার আগেই, আফজাল হোসেন এ ঘরে এসে দাঁড়ান। ঘরে ঢুকেই আর কারও দিকে না তাকিয়ে, সেলিমকে বলেন, 'কী হয়েছে রে বাবা তোর, বল আমাকে ?'

স্বামীর বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সেলিম কিছু বলার আগেই, মরিয়ম বেগম বলেন, 'তুমি ঘুমাওনি ! তোমাকে না ঘুমের টেবলেট খাইয়ে এলাম ! ঘুম ভেঙে গেল ?'

আফজাল হোসেন একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'ঘুম আসছে না, সেলিমের মা। ছেলেটা আজ আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল কেন, বলো তো ! কী হয়েছে ওর ! মেয়েটাকে যদি ও বিয়ে করতে না চায়, তো আমাকে সোজাসুজি বলতে পারল না ! বাপের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে, বলো ?'

মরিয়ম বেগম কিছু বলার আগেই বৈশাখী বলে, 'ভুল হয়ে গেছে। ভাইয়ার হয়ে আমি না হয় তোমার কাছে মাপ চাইছি বাবা।'

বৈশাখীর কথা শুনেই আফজাল হোসেন বলেন, 'এই, তুই আবার বড়দের মধ্যে কথা বলছিস কেন ?'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'আমি বড় হয়েছি বাবা। আমি এখন কলেজে পড়ি। তুমি ভুলে গেছ, তাই না বাবা ?'

সেলিম আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে বাবা। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

শুধু এটুকু শোনার জন্যেই বোধহয় এ ঘরে এসেছিলেন। ব্যস, ছুটে যান সেলিমের কাছে। বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ওরে বোকা, বাপের কাছে ছেলের কি ক্ষমা চাইতে হয় ? না, হয় না। বাপ এমনিতেই ক্ষমা করে দেয়।'

সেলিম দেখে শুধু মা নয়, বৈশাখী নয়, বাবার চোখেও জল।

গত রাতের কথা একে-একে সব খুলে বলে সেলিম।

চন্দ্রিমা উদ্যানে বসে সব শুনে, শ্রেয়া হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়।

শ্রেয়াকে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে সেলিম বলে, 'কী হল ! হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে যে !'

শেষ বিকেলের মরা রোদে কয়েকটা শালিক তখন দল বেঁধে, উদ্যানের সবুজ ঘাসের ওপর মনের আনন্দে কিচিরমিচির করছে। আনমনে শালিকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রেয়া। কিন্তু কিছু বলে না।

শ্রেয়া সেলিমের কথা শোনে কী না শোনে বুঝতে পারে না সেলিম। তাই বলে, 'কী হল তোমার, শ্রেয়া ! আমার কথা তুমি শুনতে পাওনি !'

এবারও কিছু বলে না। একইরকম উদাস নয়নে অনেক দূরে তাকিয়ে, কী যেন ভাবে শ্রেয়া !

শ্রেয়াকে এভাবে চুপচাপ দেখে সেলিম বলে, 'কী ভাবছ, শ্রেয়া ? আমাকে বলবে না তুমি ?'

মাথা ঘুরিয়ে এক পলক সেলিমকে দেখে। তারপর শ্রেয়া বলে, 'ভাবছি, কপালপোড়া একটা মেয়ে আমি। কেন একটা চিরদুঃখী মেয়ের এ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়ালে, বলো তো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হেসে বলে, 'তোমার এত দুর্ভাগ্য ভাগাভাগি করে নিতে চাই বলে।'

অনেক কষ্টেও শ্রেয়া সেলিমের কথা শুনে ম্লান হেসে বলে, 'কারও দুঃখ-কষ্ট, কারও কান্না কেউ কি শেয়ার করতে পারে, বলো ? না, পারে না। যার-যার দুঃখ সে শুধু তারই।'

শ্রেয়ার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে সেলিম দ্রুত বলে, 'ব্যস, শুরু হয়ে গেল তো তোমার প্যানপ্যানানি-ঘ্যানঘ্যানানি ! শোনো, প্লিজ আজ নো পুরানো কাসুন্দি। এখন বলো, কী করব ? মাকে তো তোমার নাম বলতে হবে নাকি ?'

নিজের অজান্তেই বোধহয় কেঁদে ফেলে। দু'টি জলে ডোবা চোখ তুলে, শ্রেয়া এবার বলে, 'শুধু নাম বলবে, আর কিছু বলবে না ?'

সেলিম শ্রেয়ার চোখে জল দেখে দ্রুত বলে, 'শুরু করে দিলে তো আবার চোখের পানি ফেলা ! সত্যি কান্নাকাটির কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থাকলে, তুমি সেকেন্ড-থার্ড না, নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যেতে।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শোনে কী না শোনে কে জানে ! দুটো ভেজা চোখে পলকহীন তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমি তোমাকে যা বলেছি, তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছ। তুমি কি শুধুই আমার নাম বলবে ? আমার সম্পর্কে কিছুই বলবে না ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, নাম বলব। আর কী বলব !'

সেলিমের কথা শেষ হতেই শ্রেয়া বলে, 'আর কি কিছুই নেই বলার মতো, বলো তুমি ?'

সেলিম বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, শ্রেয়া ! আর কী বলব ! না, আর কিছুই বলব না আমি।'

জলে ভেজা দু'চোখে তাকিয়ে কোনওমতে শ্রেয়া বলে, 'আমার সম্পর্কে আর কিছুই জানো না তুমি ? তোমার কি আর কিছুই বলার নেই ?'

সেলিম দ্রুত বলে, 'না, নেই। আমার আর কিছুই বলার নেই।'

ভেজা দুটো চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে শ্রেয়া এবার বলে, 'তোমার মা-বাবাকে ফাঁকি দেবে তুমি, সেলিম ?'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, সেলিম বলে, 'তুমি কী বলছ, তুমি কি বুঝতে পারছ, শ্রেয়া ! তোমার অতীত আমি জানি না, তা তো নয়। কিন্তু এসব বলার মানে কী, তুমি জানো !'

শ্রেয়া অস্ফুট স্বরে কোনওমতে বলে, 'জানব না কেন ? জানি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের একমাত্র ছেলের জন্যে যাকে বউ করে ঘরে তুলে নেবেন, তার সম্পর্কে তাঁদের তো সব জানতে হবে।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'তুমি এসব কী বলছ শ্রেয়া, তুমি কি বুঝতে পারছ ! তুমি কি চাও, বিয়েটা ভেঙে যাক ? তুমি কি আমার পর হয়ে যেতে চাও, শ্রেয়া ! আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাও, বলো !'

শ্রেয়া অশ্রুভেজা চোখে অসহায়ের মতো চেয়ে বলে, 'না, চাই না। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্যে হলেও, আমি তো একবার বউ সেজেছিলাম। আমার তো বিয়ে হয়েছিল। হয়নি, বলো ?'

সেলিম উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে, 'তুমি সেটা ভুলে যাবে। হ্যাঁ। চিরদিনের জন্যে ভুলে যাবে, শ্রেয়া।'

চোখে এত জল নিয়েও, ম্লান হাসে শ্রেয়া। হেসে বলে, 'চাইলেই কি ভোলা যায় ! না, সেলিম। চাইলেই সব ভোলা যায় না। জীবনে কোনও-কোনও ক্ষত থাকে, যা কখনওই বোধহয় শুকায় না।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে এবার বেপরোয়ার মতো বলে, 'যাবে। বলছি, ভুলে যাবে তুমি।'

শ্রেয়া সেলিমের কথা শেষ হলে বলে, 'এটা কম্পিউটার না, সেলিম। ইচ্ছে মতো টাইপ করলাম। ইচ্ছে হল আবার মুছে দিলাম। এটা আমার জীবন। এটা আমার অতীত। অতীতের সত্য। ভুলে যাই কেমন করে, বলো ?'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম অসহায়ের মতো বলে, 'তুমি এখন আমাকে কী করতে বলো, শ্রেয়া ?'

সেলিমের একথা শুনে, একমুহূর্ত কী যেন ভাবে শ্রেয়া ! তারপর বলে, 'তুমি তোমার মাকে সব খুলে বলবে।'

শ্রেয়ার কথা বোধহয় শেষও হয় না, সেলিম অসহায়ের মতো বলে, 'সব বলব ! সব !'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, সব বলবে তুমি।'

সেলিম উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে খানিক তাকিয়ে শ্রেয়াকে দেখে। তারপর বলে, 'কী বলছ তুমি, শ্রেয়া !'

শ্রেয়া বলে, 'যা ঠিক, তাই বলছি।'

কী হয় কে জানে ! উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেলিম বলে, 'পারব না। পারব না। কিছুতেই পারব না আমি।'

একমুহূর্ত দূরে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবে ! তারপর বলে শ্রেয়া, 'ঠিক আছে। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না।'

সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে !'

শ্রেয়া আনমনে বলে, 'যা করার আমিই করব।'

শ্রেয়ার কথা শুনে সেলিম হতবাক হয়ে যায় ! দ্রুত বলে, 'তুমি করবে মানে ! তুমি কী করবে !'

সেলিমের এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা দেখে ভাল লাগে না তা নয়। বলে, 'ভাবছি, আমি তোমার মা'র কাছে যাব।'

শ্রেয়ার কথা শুনে, সেলিমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে ! অবাক হয়ে খানিক শ্রেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'মা'র কাছে যাবে মানে ! মা'র কাছে গিয়ে তুমি কী করবে ! মা'র কাছে তোমার কী কাজ !'

পাশের দেবদারু গাছগুলোর দিকে উদাস তাকিয়ে শ্রেয়া বলে, 'বারে, কে আমি, কী আমি, সব জানতে হবে না ওনাদের ?'

সেলিমের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনই বুঝি থেমে যায় ! সে দ্রুত বলে, 'তার মানে, তোমার সব বলবে তুমি !'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, সব। বিয়ে হওয়া। বিয়ের রাতে বেশ ক'জন পুরুষের দ্বারা—'

মুখের কথা মুখেই আধাআধি থেকে যায় শ্রেয়ার। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেলিম বলে, 'ব্যস, শ্রেয়া। ব্যস। আর বলতে হবে না।'

রাগে, অভিমানে সেলিম যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে ! সেলিমের এ অবস্থা দেখে শ্রেয়া বলে, 'রাগ করো না, সেলিম। বড় অভাগী, বড় দুঃখী একটা মেয়ে আমি, জানো ? আমার ওপর তুমি রাগ করো না, প্লিজ।'

রাগে গরগর করতে-করতে সেলিম বলে, 'বড় দুঃখী একটা মেয়ে, বড় অভাগী একটা মেয়ে আমি। এই এক কথা আর কত বার বলবে তুমি, বলো ?'

শ্রেয়া এত কষ্টেও ম্লান হাসে। হেসে বলে, 'আমি দুঃখী নই, বলো তুমি ? অভাগী নই ?'

কখন কেঁদে ফেলেছে নিজেও বুঝতে পারে না সেলিম। পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ মুছে বলে, 'তুমি মা'র সঙ্গে দেখা করবে। এটা কি তোমার শেষ কথা ?'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থেকে সেলিম বলে, 'এর পরিণাম কি তুমি বুঝতে পারছ, শ্রেয়া ! এরপর কী হবে, কী হতে পারে, তুমি বুঝতে পারছ !'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবার কেঁদে ফেলে। কেঁদে শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, পারছি। হয়তো রাজি হবেন না। হয়তো অপমান করবেন। তিরস্কার করবেন।'

এই প্রথম শ্রেয়ার নরম একটা হাত, জোর করে হলেও ধরে। শ্রেয়া হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু, পারে না। শ্রেয়ার একটা হাত ধরে অসহায়ের মতো বলে, 'এই যে আমার এত প্রেম, এত স্বপ্ন দেখা, সব তুমি ভেঙে দেবে, শ্রেয়া ! ভেঙে চুরমার করে দেবে ! আমি তোমাকে ভালবাসি। বড় ভালবাসি, শ্রেয়া। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। সত্যি বাঁচব না।'

অঝোর ধারায় বৃষ্টির মতো কাঁদে। দু'গণ্ড বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। কেন যেন আর চোখ মোছে না শ্রেয়া। সেলিমের কথার উত্তরে, কোনওমতে বলে, 'আমিও তোমাকে যে কত ভালবাসি, তা আমি নিজেও জানি না।'

সেলিমের কী হয় কে জানে ! সে দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, 'না। বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না আমি।'

শ্রেয়া চোখে এত জল নিয়েও ম্লান হেসে বলে, 'বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। বড় ভালবাসি সেলিম।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেলিম বলে, 'তো কেন যাবে ! কেন যাবে মা'র কাছে, বলো ! হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে একদিন তুমি যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। তবে এমনি মাথা নিচু করে নয়, বউ সেজে।'

শ্রেয়া দূরে উদাস তাকিয়ে খানিক বোধহয় কী ভাবে ! তারপর বলে, 'না, সেলিম। তোমার মা-বাবাকে এতবড় ফাঁকি আমি দিতে পারব না। না, এতবড় প্রবঞ্চক আমি হতে পারব না।'

দ্রুত বলে সেলিম, 'তুমি আগুনে হাত দিচ্ছ, শ্রেয়া।'

শ্রেয়া বলে, 'জানি।'

সেলিম বলে, 'সে আগুনে শুধু আমার স্বপ্ন নয়, তোমার স্বপ্নও জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

শ্রেয়া আবার বলে, 'হ্যাঁ, জানি। জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারি। এটা আমি জানি।'

সেলিম শ্রেয়ার যে হাতটা ধরে রেখেছিল, তা এবার ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতো বলে, 'তাহলে কেন যাচ্ছ ! কেন যাচ্ছ তুমি, আমার মা'র কাছে !'

শ্রেয়া বলে, 'ওনাদের সঙ্গে এতবড় প্রতারণা করা ঠিক নয়, তাই।'

সেলিম বলে, 'তুমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়েছ, তাই না !'

সেলিমের ব্যঙ্গ করে বলা কথা গায়ে মাখে না। কেবল ম্লান হাসে।

শ্রেয়া কিছু না বললেও, সেলিম যে থেমে থাকে তা নয়। বলে, 'তুমি মহাভারত পড়েছ, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া এবারও কিছু বলে না। অবাক হয়ে সেলিমকে কেবল দেখে।

সেলিম আবার বলে, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মপুত্র বলে খ্যাত, সত্যবাদী বলে খ্যাত যুধিষ্ঠিরও কিন্তু শেষমেষ মিথ্যে বলেছেন। প্রয়োজনে দু'-একটা মিথ্যে বললে কিচ্ছু হয় না, শ্রেয়া।'

কী ভেবে শ্রেয়া এবার বলে, 'তোমার বাবা কখন বাড়ি ফেরেন, সেলিম ?'

সেলিম স্বভাবতই অবাক হয়। অবাক হয়ে বলে, 'কেন !'

শ্রেয়া বলে, 'আছে। কারণ আছে। তুমি বলো।'

সেলিম বলে, 'ফিরতে-ফিরতে রাত আটটা-সাড়ে আটটা হয়ে যায়।'

শ্রেয়া নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়। দেখে, সাড়ে পাঁচটা বাজে। তাই দ্রুত বলে, 'চলো।'

সেলিম অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় ?'

শ্রেয়া বলে, 'তোমাদের বাড়িতে।'

সেলিম দ্রুত বলে, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, শ্রেয়া !'

সেলিমের এত উদ্বেগ দেখে শ্রেয়া হেসে বলে, 'হইনি। তবে তোমাকে না পেলে যে হব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

কী হয় কে জানে ! সেলিম কেঁদে ফেলে। কেঁদে বলে, 'আমি তোমাকে সত্যি বুঝতে পারছি না, শ্রেয়া। সত্যি, বুঝতে পারছি না।'

অনেক কষ্ট করে হলেও শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি। তুমি যে আমাকে খুব ভালবাস, তাও বুঝতে পারছি। এখন, চলো তো।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ মুছে, সেলিম বলে, 'কেন এলে ! কেন এলে শ্রেয়া, তুমি আমার জীবনে ! আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিতে, কেন এলে তুমি ! '

সেলিমের চোখে এত জল দেখে, নিজেরও কান্না পায় না তা নয়। কিন্তু না, এবার আর কাঁদে না। কষ্ট করে হলেও কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলে, 'কেন এসেছি ? তোমাকে অনেক-অনেক ভালবাসব বলে এসেছি, বুঝেছ ? তো চলো, যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার মা'র ঝাঁটাপেটা খেয়ে আসি। আর শোনো, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে বাসায় ঢুকবে না। আমি একা ঢুকব। তুমি বাইরে থাকবে।'

শ্রেয়া কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

সেলিম বলে, 'না গেলে হয় না, শ্রেয়া ?'

শ্রেয়া বলে, 'না, হয় না।'

সেলিম আবার বলে, 'আর একবার ভেবে দেখ, শ্রেয়া।'

শ্রেয়া হেসে বলে, 'তুমি চলো তো। ওঠো।'

আজ এই প্রথম শ্রেয়া সেলিমের একটা হাত ধরে। হাত ধরে টেনে তোলে সেলিমকে।

না, আর বসে থাকতে পারে না। শ্রেয়ার সঙ্গে হেঁটে দু'জনে সংসদ ভবনের পেছনের রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

শ্রেয়া হাতের ইশারায় একটা বেবিট্যাক্সিকে থামতে বলে। বেবিট্যাক্সি থামতেই দু'জন বেবিট্যাক্সিতে উঠে বসে। উঠেই সেলিম বলে, 'ড্রাইভার, নয়াপল্টন চলো।'

বাসার সামনে এসে বেবিট্যাক্সি থেকে নামতেই শ্রেয়া বলে, 'তুমি থাক। আমি একাই যাব।'

সেলিমের মুখ-চোখ গম্ভীর, থমথমে। সে বলে, 'চারতলায় হাতের ডান দিকের বাসা।'

শ্রেয়া আর অপেক্ষা করে না। সেলিমকে বাড়ির বাইরে রেখেই ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে যায়। চারতলার নির্দিষ্ট দরজার সামনে কিন্তু আর পৌঁছুতে পারে না। তিনতলা পর্যন্ত উঠেই ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায় পা দুটো যেন আর চলে না। কিন্তু এতদূর এসে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। দুরু-দুরু বক্ষে তাই চারতলায় উঠে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পাতলে নিজের বুকের হৃদস্পন্দন বুঝি নিজেই শুনতে পাবে।

কাঁপা হাতে কোনওমতে কলিংবেল টেপে শ্রেয়া।

দৌড়ে এসে বৈশাখী দরজা খুলে দাঁড়ায়। দরজা খুলে বৈশাখী শ্রেয়াকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না !

শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'বৈশাখী, আমি তোমার শ্রেয়া আপু। কি হল, আমাকে চিনতে পারছ না !'

বৈশাখীর ঘোর কেটে যেতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না। শ্রেয়ার কথা শুনে তাই দ্রুত বলে সে, 'শ্রেয়া আপু, তুমি এসেছ ! আমি তো ভাবতেই পারছি না ! এসো, জলদি ভেতরে এসো।'

টেনে-হিঁচড়ে ভেতরে ঢোকায়। ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েই, শ্রেয়াকে জড়িয়ে ধরে। জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বৈশাখী বলে, 'না, আর বেশিদিন এসব আপু-টাপু বলতে পারব না। জলদি এবং ঝটপট ভাবী বলতে চাই। সেদিন কবে এবং কত দূরে, বলো ?'

বৈশাখীর কথা শুনে, লজ্জায় লাল হয়ে যায় শ্রেয়া। বলে, 'ধ্যাৎ, কী যে বলো বৈশাখী, তার ঠিক নেই !'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই বৈশাখী এবার বলে, 'চলো, মা'র ঘরে চলো। মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন না, শ্রেয়া আপু।'

বৈশাখীর কথায়, শ্রেয়া কিছু বলে না। বৈশাখী কথা শেষ করে যে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তা নয়। শ্রেয়ার একটা হাত ধরে টেনে মা'র সামনে হাজির করে।

মরিয়ম বেগম তখন নামাজ পড়ে উঠে, জায়নামাজ গুছিয়ে রাখছিলেন।

ঘরে ঢুকেই বৈশাখী বলে, 'মা দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি।'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর সঙ্গে শ্রেয়াকে দেখেই, হেসে বলেন, 'আরে, তুমি ! তুমি কখন এসেছ মা !'

শ্রেয়া কোনওমতে বলে, 'এখনই এলাম।'

মরিয়ম বেগম বলে, 'বাহ্, তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ ! তা এতদিনে আমাদের কথা মনে পড়ল ? এ্যদ্দিন আসনি কেন, মা ?'

মরিয়ম বেগমের কথার উত্তরে শ্রেয়া কিছু বলার আগেই বৈশাখী বলে, 'মা, বড় মেহমান এসেছে, কী খেতে দেবে, বলো তো ? এ তো গরিবের বাড়িতে হাতির পা হয়ে গেল।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'আমি কিছু খাব না।'

মরিয়ম বেগম বলেন, 'তোমার কথা মতো তো চলবে না মা। গরিবের বাড়ি হলেও, এই প্রথম তুমি এলে। আমি যা দেব, তা তোমাকে নিশ্চয়ই খেতে হবে, বুঝেছ ?'

শ্রেয়া বলে, 'আমরাও গরিব মা। আমার মা স্কুলে পড়ান। বাবা নেই।'

শ্রেয়ার কথা শেষ হতেই বৈশাখী বলে, 'মা, আমি ঝিকে আগে চা বসাতে বলি, কেমন ?'

শ্রেয়া এবার বলে, 'মা, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'বেশ তো, বলবে। আমিও শুনব।'

শ্রেয়া এবার বৈশাখীর দিকে চেয়ে বলে, 'বৈশাখী, তুমি একটু বাইরে যাবে ? আমি একটু কথা বলব।'

বৈশাখী শ্রেয়ার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে, অবাক না হয়ে পারে না। অবাক হয়ে তাই বলে, 'কী হয়েছে তোমার, শ্রেয়া আপু ! তোমার মুখ-চোখ এত গম্ভীর কেন, বলো তো !'

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রেয়া কিছু বলে না। শ্রেয়া কিছু না বললেও, মরিয়ম বেগম বলেন, 'তুই এখন যা তো এ ঘর থেকে, বৈশাখী। ও বোধহয় আমাকে কিছু বলবে।'

বৈশাখী কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সে আর দাঁড়িয়ে থাকে, তা নয়। বেরিয়ে যায়।

বৈশাখী চলে যেতেই, শ্রেয়া আচমকা ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে। শ্রেয়াকে এভাবে কাঁদতে দেখেই মরিয়ম বেগম বলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন মা ! কী হয়েছে তোমার ! আমাকে বলো ?'

মুষলধারে বৃষ্টির মতো কেঁদে শ্রেয়া বলে, 'আমি আপনার কাছে এসেছি মা।'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'তুমি কিন্তু আমাকে মা বলছ !'

শ্রেয়া বলে, 'হ্যাঁ, বলছি। আপনি আমার মা। আপনি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেও আমার মা।'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'বেশ তো। তা কী বলতে এসেছ, বলো মা ?'

শ্রেয়া একে-একে নিজের জীবনের কথা, অতীতের কথা, সেলিমের সঙ্গে সম্পর্কের কথা, সব অকপটে খুলে বলে। কোনও কিছুই লুকায় না।

সব শুনে মরিয়ম বেগম যেন স্তব্ধ হয়ে যান ! কিছুই বলেন না।

অশ্রুভেজা দুটো বড়-বড় চোখে তাকিয়ে অসহায়ের মতো শ্রেয়া বলে, 'আমি জানি, বামন হয়ে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছি আমি। বড় ঘৃণার জীবন আমার। আমাকে জেনে-শুনে কে মেনে নেবে, বলুন ! না। কেউ মেনে নেবে না, এটা আমি জানি।'

মরিয়ম বেগম অনেকক্ষণ পর এবার বলেন, 'তবু কেন এসেছ ? এখানে কেন এসেছ তুমি, বলো ?'

না, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। মরিয়ম বেগমের এ প্রশ্নে, হাউমাউ করে কেবল কেঁদে ফেলে।

দাঁতে দাঁত চেপে মরিয়ম বেগম একমুহূর্ত কী যেন ভাবেন ! তারপর বলেন, 'তোমার সাহস দেখে, সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

না, শ্রেয়া এবারও কিছু বলে না। কেবল মাথা নিচু করে অবিরাম কাঁদে।

মরিয়ম বেগম আবার বলেন, 'সত্যি, তোমার সাহসের আমি প্রশংসা না করে পারছি না।'

মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে কথা বলছিল। এবার উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে নিজের শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে বলে, 'আমি তাহলে যাই, মা।'

কী হয় কে জানে ! মরিয়ম বেগম ধমকের সুরে বলে, 'উঠলে কেন ! বসো। বসো, তুমি।'

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো আবার বসে।

মরিয়ম বেগম শ্রেয়াকে আবার আগের মতো বসতে দেখেই বলেন, 'তুমি আজ প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছ। না খেয়ে যাবে, তা কী করে হয় ?'

মরিয়ম বেগমের এ কথার উত্তরে, শ্রেয়া কিছু বলে না। মাথা নিচু করে কেবল বসে থাকে। আর কাঁদে।

মরিয়ম বেগম আবার বলেন, 'হ্যাঁ, বলতে দ্বিধা নেই, তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করছি মা।'

শ্রেয়া এবারও কিছু বলে না। তাছাড়া এখন কী বলবে সে ! আর কী-ইবা বলার আছে তার। তাই বসে থেকে কেবল কাঁদে। দু'গণ্ড বেয়ে অবিরাম ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে তার।

ক্রন্দনরত শ্রেয়ার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে, মরিয়ম বেগম এবার খানিক মিষ্টি হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, মা। তোমার মতো একটা সাহসী মেয়েকেই বোধহয় আমি এ্যদ্দিন, আমার বোকা ছেলেটার জন্যে মনে-মনে খুঁজছিলাম।'

চমকে তাকায় শ্রেয়া ! আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও এত খুশি হতো কি না কে জানে ! অস্ফুট স্বরে শুধু বলে, 'মা।'

মরিয়ম বেগম চেয়ার থেকে উঠে, শ্রেয়ার কাছে এসে দাঁড়ান। নিজের শাড়ির আঁচলে শ্রেয়ার দু'গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়া জল মুছে দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, মা। আমি তোমার মা-ই তো। এখন থেকে তুমিও আমার সন্তান, বুঝলে ? একটাই শুধু কাজ তোমার, আমার ছেলেটাকে একটু দেখো মা।'

খুশি ! খুশি !! খুশি !!! রক্তের মধ্যে হাজারো খুশির বীণা যেন একসঙ্গে বেজে ওঠে ! না। কী বলবে না বলবে কিছুই বুঝতে পারে না শ্রেয়া !

বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আড়িপেতে সব শুনছিল। এবার ঝড়ের বেগে ভেতরে এসে ঢোকে। ঢুকেই বৈশাখী বলে, 'মা, তোমার কাছে একটা অনুমতি চাই। বলো, অনুমতিটা দেবে কি দেবে-না, বলো ?'

মরিয়ম বেগম বৈশাখীর কথা শুনে অবাক হয়ে বলেন, 'কিসের অনুমতি!'

অনেক খুশিতে টালমাটাল বৈশাখী খিলখিল করে হেসে বলে, 'গ্রেট ! সত্যি তুমি গ্রেট মা ! এ কারণে তোমাকে টুপ করে একটা সালাম করতে চাই আমি, বুঝেছ ?'

মরিয়ম বেগম হেসে বলেন, 'সালাম করতে চাস, করবি। তার জন্যে আবার অনুমতি লাগে নাকি ! মাকে সালাম করতে অনুমতি লাগে, জন্মেও শুনিনি বাপু !'

বৈশাখী এবার হেসে দ্রুত মাকে সালাম করে।

ইচ্ছে করেই শ্রেয়াকে কিন্তু সালাম করে না। মাকে সালাম করে, শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে অফুরন্ত খুশিতে খিলখিল করে হেসে বলে, 'নো, নেভার। তোমাকে আমি কখনও সালাম করব না। তুমি মুরব্বী হয়ে এ বাড়িয়ে আসবে, এসে আমাকে শাসন করবে, তা হবে না। তুমি আমার মুরব্বী-টুরব্বী না, বুঝেছ ? কখনও না। তাহলে এ বাড়িতে তুমি আমার কী হবে, বলো তো ? হ্যাঁ, তুমি হবে আমার বন্ধু। পরম বন্ধু, সই।'

অন্তহীন আনন্দে শ্রেয়াও যেন দুলতে থাকে। চেয়ার ছেড়ে সে এবার উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বৈশাখীকে কাছে টেনে নেয়। কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, বৈশাখী। হ্যাঁ, আমি এ বাড়িতে তোমার বন্ধু হব। বোন হব। সই হব। আরও কত কী হব !'

আর বলতে পারে না শ্রেয়া। ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে।

শ্রেয়াকে কাঁদতে দেখে, বৈশাখীও এত খুশির মধ্যে কেন যেন নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলে।

দু'জনকে এভাবে কাঁদতে দেখে, মরিয়ম বেগমের দুটো চোখও জলে ভরে ওঠে। তিনি কোনওমতে কান্না লুকিয়ে বৈশাখী ও শ্রেয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'গাধাটাকে দেখছি না কেন ? এই বৈশাখী, তোর ভাইয়াটা কোথায় গেল রে ? এতদিন ধরে ডুবে-ডুবে পানি খাচ্ছে। মাকে কিছুই বলেনি। আজ আসুক বাড়িতে। মজা দেখাব।'

না, শেষমেষ চোখের জল আর লুকিয়ে রাখতে পারেন না মরিয়ম বেগম। অঝোর ধারায় বৃষ্টির মতো তিনিও কেঁদে ফেলেন।

না, বিয়েতে আর কোনও বাধা আসে না।

শ্রেয়া ভাবতেও পারেনি, এত সুখ এসে ধরা দেবে তার এই দুঃখী জীবনে!

সুখের দোলদোল নাগরদোলায় যেন দুলতে থাকে শ্রেয়া। সেলিম অনেক বললেও, অনার্সের পর আর মাস্টার্সটাও দেয় না। সোজা এসে সেলিমের চাকরিস্থল রাজশাহীতে সেলিমের গৃহিণী হয়ে, ঘর-দোর নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কী করে যে বেশ ক'বছর চলে যায়, টেরও পায় না দু'জনে কেউ।

উপশহরে সাজানো-গোছানো ছিমছাম কোয়ার্টার, সেলিমের প্রাণ উজাড় করা ভালবাসা, সব মিলিয়ে শুধু সুখ নয়, বড় বেশি সুখেই কাটছিল দিন।

ঘরজুড়ে এত ভালবাসা, সুখ, এরমধ্যে কখন যে এক-দু'বছর করে দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে, বুঝতেও পারেনি শ্রেয়া।

এত সুখ, সেলিমের এই এত অফুরান ভালবাসার মধ্যেও, আজকাল প্রায়ই মনে হয় কী যেন নেই, কোথায় যেন ফাঁকা ! একটা শূন্যতা এসে যেন প্রায়ই গ্রাস করতে চায়, শ্রেয়ার এত সুখ আর অন্তহীন ভালবাসার এই জীবনকে।

কত দিন কাঁদেনি। কিন্তু আজকাল সময়ে-অসময়ে কেন যেন চোখ দুটো আবার জলে ভরে ওঠে ! বারান্দায় কিংবা জানালায় দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে, কেন যেন আজকাল যখন-তখন বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো কেঁদে ফেলে !

ইদানীং একটা কথাই মনে হয়, এত কিছু থেকেও কী যেন নেই তার ! এত কিছু থেকেও এই যে কী যেন কী না থাকার একটা কষ্ট, তা যেন অহর্নিশ পেয়ে বসে তাকে !

সেলিমের ঘর জুড়ে সাজানো এত ভালবাসার সংসারে, শ্রেয়ার আজকাল নিজেকে বড় বেশি একা লাগে, নিঃসঙ্গ লাগে। কী যেন জীবনে সত্যি পায়নি সে!

এ পৃথিবীতে একটা মানুষের বিরুদ্ধেই সত্যি তার কোনও অভিযোগ নেই। সে সেলিম। তবু এটা তো ঠিক, না পাওয়ার একটা যন্ত্রণা ইদানীং সকাল, দুপুর, রাত কুরেকুরে খায় তাকে !

সেলিমের বিরুদ্ধে কখনও কোনও অভিযোগ না থাকলেও, নিজের বিরুদ্ধেই আজ যেন একটা বড় বেশি অভিযোগ শ্রেয়ার। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে মাঝে-মধ্যে উত্তর জানতে চায় সে, দুনিয়ার প্রায় সব মেয়েদের কোল আলো করে সন্তান এলেও, কেন তার কোল জুড়ে একটা সন্তান আসে না !

একাকী এই একটা প্রশ্ন নিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে নাড়াচাড়া করে, আর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারার বৃষ্টির মতো জল ঝরে পড়ে ! কেন তামাম দুনিয়ার সবাই মা হতে পারলেও, সে মা হতে পারবে না, বুঝতে পারে না।

সেলিম যে শ্রেয়ার দুঃখ বুঝতে পারে না, তা নয়। শ্রেয়াকে যখন-তখন বিষণ্ন হয়ে যেতে দেখে, সেদিন নাস্তার টেবিলে সেলিম হেসে বলে, 'তোমার কী হয়েছে, শ্রেয়া ? সব সময় মুখটাকে পাটীগণিতের শিক্ষকের মতো এত দুঃখী করে রাখ কেন, বলো তো ?'

সেলিমের প্রশ্ন শুনে খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'কই, না তো। কিছু না।'

শ্রেয়ার কথার উত্তরে সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'আমি জানি শ্রেয়া, তুমি রাত-দিন কী ভাব। তোমার যখন-তখন এত দুঃখ দেখে, মাঝে-মাঝে কী ইচ্ছে করে, জানো ?'

শ্রেয়া বলে, 'কী ?'

সেলিম বলে, 'সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যাই। গিয়ে ধ্যান করি।'

সেলিমের কথা শুনে এবার বোধহয় না হেসে পারে না। ফিক্ করে হেসে বলে, 'তা মানা করেছে কে ? যাও না।'

শ্রেয়ার মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা সফল হয়েছে দেখে, সেলিম একগাল হেসে বলে, 'তোমাকে ফেলে কী করে যাই, বলো ? শোনো মাই ডিয়ার সুন্দরী শ্রেয়া, কান পেতে শোনো। ঠিক করেছি মরার সময়ও, তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে মরব। একা মরবই না। নো, নেভার।'

সেলিমের কথা শেষ হতে না হতেই শ্রেয়া বলে, 'পৃথিবীতে মানুষ আসে একা। যায়ও একা। স্বামী-স্ত্রী দু'জন একসঙ্গে মরে, জন্মেও শুনিনি।'

অমলেটের শেষ টুকরাটা কাঁটা চামচ দিয়ে মুখে দিয়ে সেলিম হেসে বলে, 'একা মরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ব্যস। আমার সাফ কথা, তোমার-আমার

মিলন হয়েছে। মরণের আগ পর্যন্ত নো বিরহ, নো বিচ্ছেদ, বুঝেছ ?'

শ্রেয়া চায়ের পট থেকে চা ঢালতে-ঢালতে বলে, 'পাগলের পাগলামি বুঝতে পারব কেন ? হ্যাঁ, বুঝেছি। যেন আজরাইল এসে বলবেন, তোমরা দু'জন দু'জনকে বড় ভালবাস তো, তাই একসঙ্গে নিতে এলাম, চলো যাই।'

সেলিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। তোমাকে ভালবেসে আমি পাগল হয়েছি। এ কথা বলতে আমার কোনও লজ্জা নেই।'

চা পান করা শেষ করে সেলিম উঠে দাঁড়ায়। অফিসে যাওয়ার জন্যে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে কী ভেবে এবার বলে, 'শোনো, আগামী মাসের পনেরো তারিখ দশ দিনের জন্য লন্ডন যাচ্ছি।'

শ্রেয়া হাসে। হেসে বলে, 'এ আর নতুন কী ? এ তো হরহামেশাই লন্ডন, আমেরিকা করছ।'

সেলিম মুচকি হেসে বলে, 'এবার কিন্তু অন্যরকম।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন ! অন্যরকম কেন !'

সেলিম বলে, 'এবার তুমিও যাচ্ছ।'

শ্রেয়া অবাক হয়ে বলে, 'আমিও যাচ্ছি মানে ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সেলিম একমুহূর্ত কী যে ভাবে ! তারপর বলে, 'এবার তোমাকেও সঙ্গে নেব। কারণ যে নেই, তা নয়।'

শ্রেয়া দ্রুত বলে, 'কেন ! কী কারণ, বলো !'

সেলিম ধীরে-ধীরে বলে, 'ঢাকা, দিল্লী, কোলকাতা, সিঙ্গাপুর, নানা জায়গায় তো বেশ ক'বছর ধরে ডাক্তার দেখালাম। চিকিৎসাও হল। চলো, এবার লন্ডনে বড় ডাক্তার দেখাব, শ্রেয়া।'

শুনেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, 'জনম দুঃখী একটা মেয়ে আমি। আমার কপালে শুধু দুঃখ লেখা আছে। আমার সে দুঃখ তুমি ঘোচাবে কেমন করে, বলো ?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে সেলিম শ্রেয়ার দু'চোখ মুছে দিয়ে বলে, 'আমি তো তোমার আছি। আমি তো তোমাকে ভালবাসি। এর চেয়ে আর বেশি, কী চাই তোমার, বলো ?'

শ্রেয়া ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে কোনওমতে বলে, 'আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস। এই একটা সত্য নিয়েই তো বেঁচে থাকা আমার। তোমার এত ভালবাসাই তো, আজও বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।'

সেলিমের অফিসের সময় হয়ে যাওয়ায়, সে আর কিছু বলে না। অফিসে চলে যায়।

যথাসময়ে লন্ডনে যায় ঠিকই। ডাক্তারও দেখায়।

কিন্তু লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর, বছর খানেকের মতো কেটে যায়। শ্রেয়া দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখে। প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু, না। শ্রেয়ার মা হওয়ার স্বপ্ন, কেবল স্বপ্নই থেকে যায়।

আফজাল হোসেন চাকরি শেষে সস্ত্রীক দেশের বাড়ি চলে গেলেও, মাঝেমাঝেই একা অথবা স্ত্রীকে নিয়ে ছেলের কাছে আসেন। যে ক'টা দিন থাকেন, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটে শ্রেয়ার রাত-দিন।

মরিয়ম বেগম কিছু না বললেও, উঠতে-বসতে আফজাল হোসেন বলেন, 'কী হল, বৌমা ! ছেলে-পুলের দেখা নেই যে ? আমি নাতি-পুতির মুখ না দেখেই মরব নাকি, বলো ?'

শ্রেয়া কিছু বলে না। মুখ বুজে থাকে। আড়ালে কাঁদে।

বৈশাখী অবশ্য মাঝে-মধ্যে সময় পেলেই, একা অথবা স্বামী-ছেলেকে নিয়ে আসে।

বৈশাখীর বিয়ে অবশ্য শ্রেয়াই ঠিক করেছিল। ছেলে বুয়েট থেকে পাশ করেছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এখন কুমিল্লায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কাজ করে। বাসাবোতে তাদের বাসার পাশেই থাকত। আসতে-যেতে কেমন যেন হ্যাবলার মতো তার দিকে চেয়ে থাকত। হয়তো শ্রেয়াকে উদ্দেশ্য করে দু'-একটা প্রেমপত্রও লিখে থাকবে। কিন্তু দেয়ার সাহস ছিল না বলে, দেয়নি।

প্রায়ই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, শ্রেয়া একদিন কেন যেন এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আচ্ছা, বিরহী প্রেমিকের মতো আপনি এভাবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন, বলুন তো ? শোনেন, আমি একজনকে ভালবাসি। আরও শোনেন, আপনার জন্যে আমি একটা কনে ঠিক করেছি। আপনি অনুমতি দিলে, আপনার মা-বাবার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আমার ঠিক করা কনে আপনার পছন্দ হবে, বুঝেছেন ?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তখন মাত্র পাশ করেছে। চাকরি হয়নি। বিয়ে করার পরই চাকরি হয়ে যায়।

ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের ঘরে বৈশাখী এখন সুখেই আছে। বছর খানেক আগে একটা পুত্র সন্তানের মা হয়েছে সে।

গতকাল দুপুরে বৈশাখী স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির। বৈশাখীকে

দেখে অবশ্য ভালই লাগে। কারণ শ্রেয়া জানে, বৈশাখী তাকে শুধু ভালবাসে না, খুব ভালবাসে।

কিন্তু গতকাল বিকেলে বৈশাখীর একটা কথা, অন্তরে গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হয়। শ্রেয়াকে বিষণ্ন দেখে বৈশাখী বলে, 'ও রাজি হোক কিংবা না হোক, আমার এরপর ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, আমি তোমাকে দিয়ে দেব ভাবী। দেব মানে, একেবারে চিরদিনের জন্য দিয়ে দেব, দেখ।'

যদিও খোলা মনের বৈশাখী উদার মনেই কথাটা বলে, শ্রেয়ার কিন্তু ভাল লাগে না। তার অন্তর-মন জুড়ে মা হওয়ার তীব্র বাসনা। কিন্তু তাই বলে, ধার করে মা হতে চায় না সে। যদিও কিছু বলে না, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে একটা যন্ত্রণা দ্রুত ছড়িয়ে যায় তার রক্তের মধ্যে।

রাতে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সেলিমকে বলে শ্রেয়া, 'আচ্ছা, তোমার কোনও দুঃখ নেই ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে হেসে বলে, 'না, নেই। কোনও দুঃখ নেই আমার। তোমাকে চেয়েছি, পেয়েছিও। ব্যস, আমি সুখী। খুব সুখী।'

খানিক কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আমার কাছে তোমার কি কিছুই চাইবার নেই ?'

সেলিম বলে, 'হ্যাঁ, আছে।'

শ্রেয়া বলে, 'কী ?'

সেলিম নিঃশব্দে হেসে বলে, 'ভালবাসা।'

শ্রেয়া আবার খানিক কী যেন ভাবে ! ভেবে বলে, 'আর কিছু চাও না ?'

সেলিম এবার বলে, 'তুমি কী বলতে চাও, আমি জানি। চাই। একটা সন্তান আমিও চাই না, তা নয় শ্রেয়া।'

বিছানায় শুয়ে থেকেই কেঁদে ফেলে। কেঁদে বলে, 'অথচ আমি তোমাকে তা দিতে পারিনি।'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে বলে, 'সে জন্যে আমি কি তোমাকে কখনও কিছু বলেছি, বলো ? এটা ভাগ্য। শুধু তোমার নয়, আমারও ভাগ্য। কষ্ট না পেয়ে, একে মেনে নেয়াই কী ভাল নয়, বলো ?'

না, শ্রেয়া আর কথা বাড়ায় না। বিছানায় শুয়ে থেকে, নীরবে কেবল চোখের জল ফেলে।

ভেবেছিল নীরবে চোখের জল ফেলেই বোধহয় দিন কেটে যাবে। কিন্তু না, শ্রেয়ার জন্যে আরও ঘটনা, আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে।

মাস কয়েক পরেই হঠাৎ আফজাল হোসেনের অসুস্থতার টেলিগ্রাম পেয়ে, বাড়ি চলে যেতে হয় সেলিমকে। দিন সাতেক পরে আবার ফিরেও আসে। কিন্তু বাড়ি থেকে ফেরার পরই, কেমন যেন লাগে শ্রেয়ার !

আগের মতো আর হাসি-খুশি না, কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে। যখন-তখন কী যেন ভাবে !

সেদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে, খেতে-খেতে শ্রেয়া জিজ্ঞেসও করে, 'তোমার কী হয়েছে ?'

সেলিম শ্রেয়ার কথা শুনে দ্রুত বলে, 'কী আবার হবে ! কই, কিছু হয়নি তো।'

শ্রেয়া কেন যেন আর কথা বাড়ায় না। চুপচাপ থাকে।

কিন্তু পরদিন দুপুর নাগাদ কুমিল্লা থেকে বৈশাখীর টেলিফোন পেয়ে, শুধু হতবাক হয়ে যাওয়া নয়, মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ে শ্রেয়ার ! বৈশাখী এটা-ওটা কুশল জিজ্ঞেস করার পরই বলে, 'তুমি কি কিছু জানো না ভাবী, বলো তো ?'

শ্রেয়া স্বভাবতই টেলিফোনের এ প্রান্ত থেকে বলে, 'কী জানব ?'

বৈশাখী টেলিফোন ধরে রেখেই বোধহয় খানিক কী ভাবে ! তারপর বলে, 'বিশ্বাস করো, ভাইয়ার কোনও দোষ ছিল না ভাবী।'

শ্রেয়ার পক্ষে বৈশাখীর কথা বোঝার কথা নয়। বুঝতেও পারে না সে। তাই দ্রুত বলে, 'তুমি কী বলছ বৈশাখী ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার ভাইয়া কী করেছে বৈশাখী, বলো !'

শ্রেয়া বলে, 'তুমি জানো না, ভাইয়া বিয়ে করেছে !'

বুকের ভেতরটা ধক্ করে ওঠে। মনে হয়, হৃদপিণ্ডের স্পন্দনই বুঝি থেমে গেল ! হতচকিত শ্রেয়া বুকফাটা আর্তনাদ করে বলে, 'কি বলছ তুমি, বৈশাখী !'

বৈশাখী দ্রুত বলে, 'ভাবী, বিশ্বাস করো ভাবী, ভাইয়া সত্যি এ বিয়ে করতে চায়নি। বিয়ের আগে এবং পরে পুকুর ঘাটে, বাড়ির পেছনের আম বাগানে ভাইয়াকে আমি কত কাঁদতে দেখেছি। বিয়ের পোশাক পরতে গিয়েও ভাইয়াকে আমি ডুকরে শিশুর মতো কেঁদে উঠতে দেখেছি। বিশ্বাস করো তুমি, মৃত্যু পথযাত্রী অসুস্থ বাবার বাড়াবাড়ির জন্যেই ভাইয়াকে আবার এভাবে বিয়ে করতে হল। কেন, তুমি কি সত্যি কিছুই জানো না ? ভাইয়া কি তোমাকে কিছুই বলেনি, ভাবী !'

বৈশাখীর সঙ্গে আর কথা বাড়ায় না। কোনওমতে 'না' বলেই, টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকে। কারণে-অকারণে সারাজীবন ধরে কেবল কেঁদেছে। পোড়া দুটো চোখের আজ কী হয় কে জানে! না, কেন যেন একটুও কাঁদে না। শোকে, দুঃখে, অভিমানে পাষাণ প্রতিমার মতো কেবল বসে থাকে।

হঠাৎ করে ভাবে, মরে গেলে কেমন হয় ! মনে হয়, তাইতো, কেন বাঁচবে ! কার জন্যে বাঁচবে ! কিসের জন্যে বাঁচবে ! বেঁচে থাকার আর কি কোনও প্রয়োজন আছে ! মনে হয় শ্রেয়ার, না, নেই। বেঁচে থাকার আর বোধহয় সত্যি কোনও প্রয়োজন নেই তার।

নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায়। এক পা-দু'পা করে শোবার ঘরে এসে, টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজ-কলম বের করে দ্রুত খস্‌খস্‌ করে লেখে।

প্রিয় সেলিম,

বাধ্য হয়েও যদি তুমি আবার বিয়ে করে থাক, আমাকে বললে না কেন তুমি ? আমি তো তোমাকে আমার ঘৃণার, লজ্জার সবই বলেছিলাম। কি, বলিনি বলো ? মনে আছে তোমার বিয়ের আগেই আমরা একে-অপরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কেউ কারও কাছে কখনও কোনও সত্য গোপন করব না ? সত্য গোপন করা আর মিথ্যে এক নয়, বলো তুমি ? তুমি আমাকে বলতে। প্রয়োজনে আমরা দু'জনে তোমার ভালবাসাকে আধাআধি করে নিতাম। না সেলিম, এক বন্ধ্যা নারীর দুঃখ তুমিও বুঝলে না।

হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি। যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না, সেখানেই যাচ্ছি আমি, সেলিম। বারে, তোমার নতুন ঘরণীর জন্যে ঘর খালি করে দিতে হবে না, বলো ?

যদিও তুমি কথা রাখোনি, তবু বলি তোমার কাছে সত্যি আমি চিরঋণী। তুমি আমাকে ঘর দিয়েছ, ঘরণীর মর্যাদা দিয়েছ, যা হোক একটু ভালবাসাও দিয়েছ।

যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, তোমাকে আমি ভালবাসতাম। সত্যি বড় ভালবাসতাম, সেলিম।

ইতি

তোমারই চিরদুঃখী

শ্রেয়া

টেলিফোন পেয়েই, অফিস থেকে দ্রুত ছুটে আসে সেলিম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখে, বাড়ির বাইরে, ভেতরে, এখানে-ওখানে অনেক মানুষের জটলা। অজানা এক আশংকায় বুকটা ধক্ করে ওঠে সেলিমের !

দ্রুত ছুটে এসে দেখে, না, নেই। সব শেষ হয়ে গেছে তার। সেলিম, বৈশাখী, আফজাল হোসেন, মরিয়ম বেগমসহ প্রিয় সকল মানুষের কাছ থেকে, জগতের সকল ভালবাসা- হানাহানি থেকে দূরে, তখন অনেক দূরে চলে গেছে শ্রেয়া।

যেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না, সেখানেই চলে গেছে সে।

খবর পেয়ে পুলিশ আসে। এসেই সিলিংফ্যানের সঙ্গে ঝুলে থাকা শ্রেয়ার লাশ নামায়।

পুলিশ সন্ধ্যা নাগাদ পোস্টমর্টেমের জন্যে লাশ সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

কখন পোস্টমর্টেম শেষ হবে তার জন্যে সারারাত ধরে, মেডিকেল কলেজের বারান্দায় সর্বস্ব হারানোর বেদনায়, দু'চোখে অনেক কান্না নিয়ে বসে থাকে সেলিম।

ভোর নাগাদ পোস্টমর্টেম শেষ হয়। ডাক্তারের কাছেই জানতে পারে, শ্রেয়া আত্মহত্যা করেছে এবং সে দেড় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

হৃদয়টা যেন এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় !

বুকফাটা আর্তনাদ করে বলে, 'তুমি এ কী করলে শ্রেয়া ! এ কী করলে তুমি, বলো !'